ক্রুসেড-২৮
রক্তস্রোত
আসাদ বিন হাফিজ

ক্রুসেড - ২৮

রক্তস্রোত

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
...বাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-...

ক্রুসেড - ২৮

রক্তস্রোত

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর
'দাস্তানে ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক
আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন, ৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৫
প্রচ্ছদ : প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ : প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

CRUSADE-28
Roktosrot
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by : Asad bin Hafiz
Published by : Pritee Prokashon
435 / ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758. Fax: 880-2-8321758
Published on: December 2005
PRICE : ৫০.০০
ISBN 984-581-245-7

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠেছিল খৃস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিয়েছিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিয়েছিল মদ ও নেশার দ্রব্য। বেহায়াপনা আর চরিত্র হননের স্রোত বইয়ে দিয়েছিল মুসলিম দেশগুলোর সর্বত্র। একদিকে সশস্ত্র লড়াই, অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা– এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

আজ মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে তার স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে

▼ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ▼ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমাণ্ডো অভিযান ▼ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ▼ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ▼ ভয়াল রজনী ▼ আবারো সংঘাত ▼ দুর্গ পতন ▼ ফেরাউনের গুপ্তধন ▼ উপকূলে সংঘর্ষ ▼ সর্প কেল্লার খুনী ▼ চারদিকে চক্রান্ত ▼ গোপন বিদ্রোহী ▼ পাপের ফল ▼ তুমুল লড়াই ▼ উমরু দরবেশ ▼ টার্গেট ফিলিস্তিন ▼ গাদ্দার ▼ বিষাক্ত ছোবল ▼ খুনী চক্রের আস্তানায় ▼ পাল্টা ধাওয়া ▼ ধাপ্পাবাজ ▼ হেমসের যোদ্ধা ▼ ইহুদী কন্যা ▼ সামনে বৈরুত ▼ দুর্গম পাহাড় ▼ ভন্ডপীর ▼ ছোট বেগম ▼ রক্তস্রোত

এ সিরিজের পরবর্তী বই ক্রুসেড-২৯

যাযাবর কন্যা

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পূনর্জাগরণ। চলছে ইসলামবিরোধী
শক্তির নির্যাতন– হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র।
মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে।
কিন্তু চীনের অবস্থা? ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই?
চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?
চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে
মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না।
আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না
সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু

ও

আবুল হাশেম রনি

চীনের মুক্তিপাগল মানুষের
মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন
এক নতুন রহস্য সিরিজ– **'অপারেশন'**।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের বই

আতংকিত নানকিং ▼ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত ▼
ব্ল্যাক আর্মির কবলে ▼ হাইনান দ্বীপে অভিযান ▼ অশান্ত চীন
সাগর ▼ বিধ্বস্ত শহর ▼ ড্রাগনহিলের বিভীষিকা ▼ মৃত্যু দ্বীপ

অচিরেই বেরুচ্ছে এ সিরিজের পরবর্তী বই অপারেশন ৯

রক্তাক্ত প্রাচীর

সম্রাট আরনাতের রক্ষিতা প্রিন্সেস লিলি ওরফে কুলসুম কথা বলছিল বাকারের সাথে। কুলসুম বাকারকে বললো, 'আরনাতের সাথে আমি সুখেই ছিলাম। কিন্তু আমার অন্তরে জ্বলছিল প্রতিশোধের আগুন। সে মাঝে মাঝে আমাকে বলতো, 'সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দারা ছদ্মবেশে এখানে আসে। তারা আমাদের গোপন তথ্য নিয়ে আবার সুযোগ মত পালিয়ে যায়।' আরনাত আরও বলেছে, 'খৃষ্টান ও ইহুদী সুন্দরী মেয়েরা মুসলমানদের দেশে গিয়ে সেখানকার বড় বড় আমীর ও অফিসারকে তাদের রূপের জালে বন্দী করে ফেলে। তারা আমাদের স্বার্থ উদ্ধারে আমীরদের ব্যবহার করে।'

কুলসুম বললো, 'আরনাত আমাকে সেসব মেয়েদের কাহিনী প্রায়ই বলতো। তার গল্প শুনে আমার মনে হতো, ধর্মের জন্য ওই মেয়েরা কতই না ত্যাগ স্বীকার করছে! তারা এ জন্য নিজের সম্ভ্রম পর্যন্ত বিসর্জন দিচ্ছে। বাকার! আমিও এক নারী। আমি জানি নারীরা সম্ভ্রমকে কত অমূল্য সম্পদ মনে করে। সতীত্ব রক্ষা করার জন্য মেয়েরা নিজের জীবন দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। অথচ ওই মেয়েরা অকাতরে তা বিলিয়ে দিচ্ছে। এ যে কত বড় ত্যাগ তুমি তা কল্পনা করতে পারো?'

থামলো কুলসুম। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বললো, 'বাকার, আমার সম্ভ্রম তো লুট হয়েই গেছে। আমার ইচ্ছা, আমি আমার ধর্মের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ ও কোরবানী স্বীকার করি। প্রয়োজনে এ জন্য আমি আমার জীবন দিয়ে দেবো।

এতদিন এ ত্যাগ স্বীকারের কোন সুযোগ পাইনি আমি। আরনাত এ সম্মেলনে এসে আমার কাছে এমন গোপন তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে যে তথ্য সুলতান আইয়ুবীর কাছে পৌঁছানো জরুরী মনে করছি আমি। হয়তো এই কল্যাণময় কাজের জন্যই আল্লাহ আমাকে এই জাহান্নামের মধ্যে পাঠিয়েছে। তুমি কি মনে করো, এই সংবাদ সুলতানের কাছে পৌঁছালে তাতে কোন উপকার হবে?'

'হ্যাঁ, অনেক উপকার হবে।' বাকার বললো, 'কিন্তু এ সংবাদ আমরা নিয়ে যাবো না। আমি ও তুমি দু'জনেই যদি এখান থেকে নিখোঁজ হয়ে যাই তবে সম্রাট আরনাত বুঝে ফেলবে, আমরা দু'জনই গোয়েন্দা ছিলাম। এতে তারা তাদের পরিকল্পনা পরিবর্তন করে ফেলবে। তখন এই খবর সুলতান আইয়ুবীর উপকারে না লেগে তা তাঁর পরাজয়ের কারণ হবে।'

'তার মানে, এত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সুলতান আইয়ুবীর কাছে পৌঁছাতে পারবো না?' কুলসুমের কণ্ঠে উদ্বেগ।

'অবশ্যই এ খবর সুলতানের কাছে পৌঁছবে।' বাকার বললো, 'আগে ক্রাকে যাই, ওখানে গিয়েই আমি এ খবর পাঠানোর ব্যবস্থা করবো।'

'তুমি নিজে যাবে?' কুলসুম জিজ্ঞেস করলো, 'কিন্তু তুমি চলে গেলে আমি যে এখান থেকে পালাতে চাচ্ছি তার কি হবে?'

'আমি যাবো না, তুমিও পালাবে না।' বাকার বললো, 'ক্রাকে আমার সঙ্গী রয়েছে। খবর পৌঁছানোর দায়িত্ব তারাই

পালন করবে। আমার দায়িত্ব শুধু তথ্য জোগাড় করা। তোমার কাজ এখনও শেষ হয়নি, সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আমি তোমাকে জানাবো সুলতান আইয়ুবীর কেমন ধরনের সংবাদ প্রয়োজন। সে সংবাদ তুমি আমাকে জোগাড় করে দেবে আর আমি তা দামেশক পর্যন্ত পৌঁছে দেবো।'

'তবে আমাকে এই জাহান্নামেই থাকতে হবে?' কুলসুম উদাস কণ্ঠে বললো।

'হ্যাঁ।' বাকার উত্তর দিল, 'তোমাকে এই জাহান্নামে এবং মৃত্যুর মুখোমুখিই থাকতে হবে কুলসুম! যদি তুমি জাতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে চাও তবে এরচে ভাল কোন সুযোগ পাবে না। দ্বীনের জন্য এমন কোরবানী দেয়ার সুযোগ সবার ভাগ্যে জোটে না।'

কুলসুম শুনছিল বাকারের কথা। নতুন এবং অদেখা এক জগত যেনো তার চোখের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে। সে অবাক বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলো বাকারের দিকে। বাকার বললো, 'গোয়েন্দাদের ব্যাপারে সুলতান কি বলেন জানো? তিনি বলেন, একটি মাত্র গোয়েন্দা আমাদের সমস্ত সৈন্যবাহিনীর জয় ও পরাজয়ের কারণ হতে পারে। তাদের মিশন খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ঝুঁকিবহুল। গোয়েন্দারা প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকে। শুধু মৃত্যু নয়, মৃত্যুর অধিক বিপদ ওঁৎ পেতে থাকে তাদের জন্য। কোন গোয়েন্দা শত্রুদের হাতে ধরা পড়লে সঙ্গে সঙ্গে তাকে হত্যা করা হয় না। তথ্য আদায়ের জন্য তাদের দেয়া হয় কঠিন শাস্তি। তাদের চামড়া ছিলে তাতে লবন

মাখানো হয়। তাকে এমন কঠিন শাস্তি দেয়া হয় যে, তারচে মৃত্যু হলে সে বেঁচে যেতো। কিন্তু তাদের মরতেও দেয়া হয় না, বাঁচাতেও দেয়া হয় না।'

'কুলসুম!' বাকার বললো, 'কিন্তু নিজের ধর্ম, নিজের দেশ ও আপন জাতির জন্য কাউকে না কাউকে তো এমন ত্যাগ স্বীকার করতেই হয়। সুলতান বলেন, 'যে জাতির সন্তানদের মধ্য থেকে জাতির জন্য ত্যাগ ও কোরবানীর আবেগ নিঃশেষ হয়ে যায় অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর বুক থেকে সে জাতির অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যায়।' তুমি যেখানে নিরূপায় হয়ে চারটি বছর কাটিয়ে দিয়েছো সেখানে আরো চারটি মাস কাটিয়ে দাও মহান এক মিশন নিয়ে, নতুন এক স্বপ্ন নিয়ে।'

'তুমি বলছো, তাতে জাতির কল্যাণ হবে! আমার পাপ মোচন হবে?'

'হ্যাঁ কুলসুম! আরনাত এখন আর তোমার প্রভু নয়, সে তোমার শিকার। এ শিকার যেনো হাতছাড়া না হয় সেদিকে তোমার কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। তার সাথে আগের চেয়ে অধিক ভালবাসার ভাব দেখাবে। কিন্তু মনে রাখবে, তুমি এক বিষধর সাপকে আগলে রেখেছো। এ সাপ যদি তোমার নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে যায় তবে সে মুসলিম বিশ্বের বিরাট ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে।'

'তবে আমাকে বলো!' কুলসুম অধীর কণ্ঠে বললো, 'আল্লাহরওয়াস্তে আমাকে বলো, আল্লাহ আমার এ খেদমত গ্রহণ করবেন এবং আমাকে তিনি মাফ করে দেবেন!'

'নিশ্চয়ই! আল্লাহ বান্দার কোন আমলই বিফলে যেতে দেন না।'

'তাহলে বলো আমাকে কি করতে হবে?'

বাকার তাকে বুঝিয়ে বলতে শুরু করলো তার কি করণীয়। সে তাকে বললো, 'সবার সামনে এমন ভাব প্রকাশ করো না, যাতে তোমার ও আমার মাঝে কোন গোপন সম্পর্ক রয়েছে মানুষ এমন ধারণা করতে পারে। সব সময় মনে রাখবে, এখানে আমাদের মত গোয়েন্দাদের ধরার জন্য খৃস্টান গোয়েন্দারাও ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এটাও মনে রাখবে, এখানে শুধু আমরা দু'জনই নই, আমাদের সাথী আরো গোয়েন্দারা কাজ করছে। শুধু এখানেই নয়, খৃস্টানদের প্রতিটি শহরে ও গ্রামে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের সাথীরা।

কুলসুম, এ খবর শুনে অহংকারী ও বেপরোয়া হয়ে যেও না। মনে রেখো, এখানে খৃষ্টান জেনারেল ও শাসকরা আছেন। তারা সব আহাম্মক এমনটি মনে করার কোন কারণ নেই। এদের মধ্যেও অনেকেই আছেন যারা সাহসী ও বুদ্ধিমান। তাদেরও চোখ কান খোলা। তাই যা করবে বুঝেশুনে করবে। একদিকে নিজের বুদ্ধি বিবেক কাজে লাগাবে আর সারাক্ষণ নির্ভর করবে শুধু আল্লাহর উপর। আমরা স্বেচ্ছায় এক কঠিন দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছি। এ দায়িত্ব আমাদের পালন করতে হবে পরিপূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে। এ কাজ করতে গিয়ে যত বিপদই আসুক না কেন সবই আমাদের মাথা পেতে নিতে হবে, সহ্য করতে হবে।'

কুলসুম তাবুর কাছে এসে গাড়ী থেকে নামলো। সে এখন আর কুলসুম নয়, প্রিন্সেস লিলি। আর গাড়ীর চালক বাকার বিন মুহাম্মদও এখন একজন নিষ্ঠাবান খৃস্টান, যার নাম সায়বল। কুলসুম যখন গাড়ী থেমে নামলো, সায়বল তখন বগির পাশে এক নিরীহ চাকরের মত মাথা নত করে দাঁড়িয়ে রইলো।

প্রিন্সেস লিলি তাবুতে ঢুকে দেখলো সম্রাট আরনাত একটি নকশার ওপর ঝুঁকে আছেন। লিলি বললো, 'অমন করে কি দেখছো?'

আরনাত নকশা থেকে মুখ না তুলেই বললো, 'খুবই জরুরী জিনিস। তুমি এতোক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছিলাম।' লিলি বললো, 'সেই সাথে একটু শিকার করারও শখ চেপেছিল।'

আরনাত নকশা থেকে মুখ তুলে হাসিমুখেই জিজ্ঞেস করলো, 'তা কি শিকার করেছো?'

'কিছুই না।' লিলি উত্তর দিল, 'সব তীরই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে।' তারপর মন খারাপ করে বললো, 'তুমি তো আর আমাকে তীর চালাতে শেখাওনি যে আমি শিকার ধরতে পারবো।'

আরনাত হেসে বললো, 'তাই! তা আমাকে বলবে তো! ঠিক আছে রাণী, দেখবেন এক সপ্তাহের মধ্যে আপনি পাকা শিকারী হয়ে গেছেন।'

'তুমি সত্যি বলছো!' আনন্দিত গলায় বললো লিলি, 'কখন

শেখাবে, কবে শেখাবে?' কথা বলতে বলতে সে আরনাতের পাশ ঘেঁষে বসে পড়লো।

আরনাত আবার নকশার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল, সে আরনাতের পাশে বসে জিজ্ঞেস করলো, 'কিসের নকশা? অভিযানের, নাকি প্রতিরক্ষার?'

'অভিযান চালাবেন সুলতান আইয়ুবী।' আরনাত অন্যমনস্ক ভাবে বললো, 'আর প্রতিরক্ষাও তাকেই করতে হবে। আমরা তাকে ফাঁদে ফেলতে চেষ্টা করছি। তাঁর শক্তি যখন নিঃশেষ হবে তখন আমরা অভিযান চালাবো। তখন আমাদের বাঁধা দেয়ার আর কেউ থাকবে না।'

'সাংঘাতিক পরিকল্পনা তো!' লিলির চোখে মুখে বিস্ময়।

'হ্যাঁ লিলি, তুমি এখন তোমার তাবুতে যাও। আমাকে আরো অনেক কিছু চিন্তা করতে হবে। আজ রাতে সম্রাটদের যে কনফারেন্স হবে তাতে এই পরিকল্পনা ও নকশা পেশ করতে হবে আমকে। আমি এমন নিখুঁত পরিকল্পনা পেশ করতে চাই যাতে কোন ভুল ক্রটি না থাকে।'

'মেয়েটির নাম কুলসুম ও তার সাথীর নাম বাকের বিন মুহাম্মদ। কুলসুমকে কোন মুসলিম কাফেলা থেকে লুট করেছিল সম্রাট আরনাত, তারপর নিজের হেরেমে ঢুকিয়ে নিয়েছে। আমাদের এজেন্ট বাকার আরনাতের গাড়ী চালক। ওখানে সে খৃস্টান পরিচয়ে আছে। মেয়েটি পালাতে গিয়ে বাকারের হাতে ধরা পড়লে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে বাধ্য

হয়। তথ্যের মূল উৎস সেই মেয়ে। বাকার তাকে ট্রেনিং দিয়ে কাজের উপযোগী করে গড়ে নিয়েছে।' সুলতান আইয়ুবীর কাছে এ তথ্য তুলে ধরছিল গোয়েন্দা বিভাগের উপ-প্রধান হাসান বিন আবদুল্লাহ।

সুলতান আইয়ুবী হাসান বিন আবদুল্লাহর রিপোর্ট শুনছিলেন। তার চেহারা ক্রমেই কঠোর হয়ে উঠছিল। তিনি রক্তিম চোখে তাকালেন হাসানের দিকে। বললেন, 'হাসান, কে বলতে পারবে আমাদের কত মেয়ে কাফেরদের কাছে এমনিভাবে বন্দী হয়ে আছে? আফসোস! আমাদের পাপের কারণে আমাদের মেয়েরা আজ কাফেরদের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। আমি আরনাতকে ক্ষমা করবো না। মনে রেখো হাসান, এ মেয়েকে আমি সেখান থেকে উদ্ধার করবো। ইজ্জত বিকিয়ে দিয়ে মেয়েরা আমাকে সাহায্য করুক, এ আমি চাই না। আরে, আমি তো লড়াই করছি আমার বোন ও কন্যাদের সম্ভ্রম বাঁচানোর জন্য। একজন মুজাহিদের জীবন তো তখনই সফল হয় যখন সে তার এক বোনের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে।'

'সুলতান! ক্রাকে আমাদের যে লোক আছে তারাই সময় মতো তাকে বের করে আনবে।' হাসান বিন আবদুল্লাহ বললেন, 'আক্রার পাদ্রী ও সম্মিলিত খৃষ্টান রাজন্যবর্গ নসিবায় তিন দিন ধরে বৈঠক করে যুদ্ধের প্ল্যান ও নকশা তৈরী করেছে। কুলসুম আরনাতের কাছ থেকে সেই পরিকল্পনার পুরোটাই জেনে নিয়েছে ও বাকারকে বলে দিয়েছে। এতোক্ষণ

আমি বাকারের পাঠানো খবরই আপনার সামনে পেশ করলাম।'

খৃষ্টানরাও সুলতান আইয়ুবীর গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য সচেষ্ট ছিল। তাদের গোয়েন্দা মুশেল, হলব, দামেশক, কায়রোসহ মুসলিম অধ্যুষিত প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছড়িয়ে ছিল। তাদের মাধ্যমেই খৃষ্টানরা জানতে পেরেছিল, মিশর থেকে সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা বেরিয়ে পড়েছে। তারা আরও জানতে পেরেছে, সুলতান আইয়ুবী খুব শিঘ্রই অভিযান চালাচ্ছেন। সে জন্যই তারা প্রতিরোধ ব্যবস্থা দৃঢ় করে সুলতান আইয়ুবীকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলার পরিকল্পনা করেছে।

পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা বিভিন্ন স্থানে সৈন্য সমাবেশ করেছে। তারা এখনও জানতে পারেনি, সুলতান আইয়ুবী কোন দিক থেকে অভিযান চালাবেন আর সমরক্ষেত্র কোনটি হবে? তারা অনুমানের ওপর ভিত্তি করেই সৈন্য সাজাচ্ছিল। তবে সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য সংখ্যা, বিশেষ করে তাঁর কি পরিমাণ তীরন্দাজ, পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য এবার অভিযানে বের হয়েছে সে পরিসংখ্যান তারা পেয়ে গেছে বলে খুবই উল্লসিত ছিল তারা।

কুলসুম ও বাকারের কাছ থেকে আসা গোয়েন্দার কাছ থেকে হাসান বিন আবদুল্লাহ বিস্তারিত সংবাদ নিয়ে সুলতান আইয়ুবীর কাছে সব বিবরণ তুলে ধরলেন। সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'বিভিন্ন স্থান থেকে আসা বিবরণের সাথে এ তথ্যের

মিল আছে। এটা তো আমরা আগেই জানতে পেরেছি, খৃষ্টানরা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। এখন ক্রাকের সংবাদ এর সত্যতা আরো দৃঢ় করলো। নতুন খবর যা পেলাম তা হলো, খৃস্টান রাজন্যবর্গ তাদের মতপার্থক্য ভুলে আবারো একত্রিত হয়েছে এবং তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সম্মিলিতভাবেই তারা আমাদের মোকাবেলা করবে। অর্থাৎ এবারও আমাদেরকে খৃস্টানদের সম্মিলিত বাহিনীর সাথেই যুদ্ধ করতে হবে।'

'এ ছাড়া যে নতুন তথ্য পেয়েছি তাহলো, এবার আমরা তাদের সামরিক শক্তির একটি সঠিক পরিসংখ্যান পেয়েছি।' বললেন হাসান বিন আবদুল্লাহ, 'এবার তাদের বাহিনীতে থাকবে দুই হাজার দুইশো নাইট সৈন্য। নিঃসন্দেহে এটা এক বিরাট শক্তি। নাইটদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত থাকে লোহার পোষাক। এই পোষাকের কারণে তারা থাকে অধিক সুরক্ষিত ও নিরাপদ। নাইটদের ঘোড়াগুলোও সাধারণ সৈন্যদের ঘোড়ার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও দ্রুত গতিসম্পন্ন।'

'এ নিয়ে আমি মোটেই উদ্বিগ্ন নই। আমি তাদের এমন সময় যুদ্ধের মাঠে নামাবো যখন প্রকৃতিতে থাকবে প্রচন্ড উত্তাপের দাবদাহ। মাথার ওপর থাকবে প্রখর সূর্য, পায়ের নিচের বালি থাকবে খই ফোটা আর বাতাস থাকবে আগুনের হলকার মতোই উত্তপ্ত। তখন তাদের পোষাকই তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে।'

'আমরা আরো জানতে পেরেছি, প্রতিটি নাইট বাহিনীর সাথে থাকবে আট হাজার অশ্বারোহী ও ত্রিশ হাজার পদাতিক।'

হাসান বিন আবদুল্লাহ বললেন, 'সৈন্যের এ সংখ্যাটা কিন্তু বিশাল।'

'এটা জানা থাকায় আমার পরিকল্পনা করতে সুবিধা হবে। তবে আমি অবাক হয়েছি যে খবরটি শুনে তা হলো, আর্মেনিয়ার শাহের সৈন্যও নাকি খৃস্টানদের সাথে যোগ দিচ্ছে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'এ সৈন্য ক্রুসেডদের সৈন্যের অতিরিক্ত। আর এদের মধ্যে কেউ কেউ আছে যারা আমার যুদ্ধের কৌশল সম্পর্কে জানে। সম্ভবত ওদের পরামর্শেই ক্রুসেড বাহিনী এবার আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

'সে অনুযায়ী আপনি হাতিন এলাকা থেকে যুদ্ধ শুরু করার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা খুবই সঠিক ও যুক্তিযুক্ত হয়েছে। কারণ হাতিন অঞ্চল আমাদের জন্য খুবই উপযোগী ও পরিচিত এলাকা।'

'হে, আমার বন্ধুগণ! এখন আমাদের সামনে সেই সময় উপস্থিত, যখন আমাদের জীবন আল্লাহর রাহে বিলিয়ে দেয়ার ডাক এসেছে। এ পৃথিবীর আলো বাতাস ডেকে বলছে, ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ো মুজাহিদ। এ ফরজ আমাদের ওপর অর্পন করেছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত। তিনিই আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন, দুশমন ময়দানে এলে খবরদার ঈমানদার, কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। আমাদের হত্যা করার জন্য আজ জোট বেঁধেছে দুশমন। এ অবস্থায় কোরআন আমাদের ডেকে বলছে, হে আল্লাহর সৈনিকরা, ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ো। মারো

আর মরো। মানবতার দুশমনদের হাত থেকে বাঁচাও বিপন্ন মানুষকে।'

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী দামেশকে তাঁর বিরাট কামরায় সেনাপতি ও কমাণ্ডারদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'ক্ষমতা লাভের জন্য নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করা ও নিজেরাই শেষ হয়ে যাওয়ার জন্য আল্লাহ আমাদের সৃষ্টি করেননি। আমরা দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের অনেক রক্ত ঝরিয়েছি, ক্ষয় করেছি নিজেদের অনেক শক্তি। এই দীর্ঘ সময়ে শত্রুরা তাদের শক্তি আরও বহু গুণে বৃদ্ধি করে নিয়েছে। ফিলিস্তিন তারা শুধু দখলই করেনি, সেখানে তারা তাদের স্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

জাতি আমাদের হাতে তাদের স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার জন্য অস্ত্র তুলে দিয়েছে। আমরাও স্বেচ্ছায় এ কঠিন দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়ে সৈনিকের খাতায় নাম লিখিয়েছি। জনগণ এই আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে আমাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছে, যেন আমরা শত্রুদের নির্মূল করে তাদের স্বাভাবিক জীবন যাপন নিশ্চিত করি। যেন আরবের পবিত্র ভূমি থেকে কাফেরদের বিতাড়িত করে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের হেফাজত করি।

আমি জানি, আপনারা কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত যুদ্ধ করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই, ওটা যুদ্ধ ছিল না, ওটা ছিল ভ্রাতিঘাতি সংঘাত। গৃহযুদ্ধ আমাদের অনেক সময় ও শক্তি নষ্ট করেছে কিন্তু তাতে জাতির কোন কল্যাণ হয়নি।

আমরাই আমাদের মেরেছি আর পরষ্পর নিঃশেষ হয়েছি। কতিপয় গাদ্দারের কারণে জাতির অনেক বড় ক্ষতি হয়ে গেলো।'

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'বন্ধুরা, আসল যুদ্ধ সবেমাত্র শুরু হতে যাচ্ছে। আপনারা কেন এই যুদ্ধে জড়াতে যাচ্ছেন তা ভাল মতো বুঝে নিন। কোন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা অস্ত্র হাতে নেইনি। কোন দল বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করাও আমাদের টার্গেট নয়। পাশবিক শক্তি আজ মানবিক শক্তিকে চ্যালেঞ্জ করে বসেছে। মানুষের জীবন আজ বিপন্ন হতে চলেছে। এ জমিন আল্লাহর, এখানে হুকুম চলবে আল্লাহর। কারণ আল্লাহই ভাল জানেন কিসে মানুষের কল্যাণ আর কিসে অকল্যাণ। মানুষের জীবনকে শান্তিময় করার জন্যই তিনি তাঁর রাসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন ইসলাম।

একমাত্র ইসলামই মানবতার রক্ষাকবচ। এখানে কোন অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ নেই। আছে শাশ্বত কল্যাণ ও মুক্তির দিকনির্দেশনা। রাসূলই আমাদের নেতা। কোরআন আমাদের সংবিধান। আমরা মানতার স্বার্থে এই শাশ্বত জীবন বিধান গ্রহণ করার জন্যই সবাইকে আমন্ত্রণ জানাই। আমরা তাই অবিনাশী সত্য ও চির সুন্দরের আপোষহীন সৈনিক। আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সভ্যতার সংরক্ষণ ও মানতার কল্যাণ। অতএব মনকে জীবন্ত ও সতেজ করে তুলুন। কঠোর শপথ নিন, অশুভ, অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে। মানুষ বসবাস করবে স্বাধীন পৃথিবীতে, একমাত্র আল্লাহর গোলামী ছাড়া আর কারও গোলামী

করতে সে বাধ্য নয়। কেবল এ পথেই মানব জাতি আপন মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

বন্ধুগণ, এই লক্ষ্য হাসিলের জন্যই আমাদের পূর্ব পুরুষরা ছুটে গেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। ইসলামের বিজয় নিশান উড়িয়ে দিয়েছেন দেশ হতে দেশান্তরে। তারেক বিন জিয়াদ স্পেনের মাটিতে জ্বেলেছেন সত্যের আলো। মুহাম্মদ বিন কাসিম এই আলো নিয়েই পৌঁছেছিলেন সুদূর ভারতে। তাদের পদচিহ্ন ধরে ভবিষ্যত বংশধরদের দায়িত্ব ছিল আল্লাহর বাণী সেখান থেকে আরও দূরদূরান্তে পৌঁছে দেয়া। কিন্তু আল্লাহর সৈনিকরা যখন গাফলতির ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লো তখন আল্লাহর রাজত্ব ক্রমশ সংকীর্ণ হতে শুরু করলো।

আফসোস! শত্রুরা এখন আমাদের ঘরে এসে বসে আছে। এখন তারা আমাদের কাবাঘর ও নবীর (সা.) রওজা মুবারক ধ্বংস করার পায়তারা করছে। কেমন করে এমনটি সম্ভব হলো? ব্যক্তির মধ্যে যখন বাদশাহ হওয়ার খায়েশ জাগে আর মানুষের মধ্যে সংকীর্ণ জাতীয়তার উন্মাদনা সৃষ্টি হয় তখন মানবতা বিপর্যস্ত হয়। তখন ইসলামের বিকাশ না হয়ে বরং তা সংকীর্ণ হতে থাকে। শাসক তার গদী ও ক্ষমতার লোভে ইসলামই বিসর্জন দেয় না, নিজের লজ্জাবোধও বিসর্জন দিয়ে দেয়।

আজ বিশ্বব্যাপী সভ্যতার সংকট ও সার্বিক অবনতির কারণ শাসকবৃন্দের ক্ষমতা ও গদীর নেশা এবং মানুষের সীমাহীন লোভ ও ধনরত্নের প্রতি প্রবল আগ্রহ। প্রকৃত ঈমানদার দুনিয়ার

ওপর কর্তৃত্ব করে আর এখন দুনিয়া আমাদের উপর চেপে বসে আছে। দুনিয়ার মোহে আমরা পরকালের পরিণতির কথাও ভুলে গেছি। কে মানবতার প্রকৃত বন্ধু আর কে শত্রু সে বিচারের বিবেকও হারিয়ে ফেলেছে মানুষ। ফলে আমাদের বন্ধু ও শত্রুর পরিচয়ও আজ কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়ে গেছে।

এবার সামরিক শক্তির প্রসঙ্গে আপনাদের কিছু বলতে চাই। জাতির ভাগ্য অস্ত্রের মুখেই নির্ধারিত হয়। যাদের হাতে অস্ত্র থাকে ইতিহাস লেখা হয় সেই সব মুজাহিদদের নামে। যতদিন মুজাহিদরা নিজেদেরকে জাতির সেবক মনে করে ততোদিন তারা থাকে অজেয়। কিন্তু যখন সেই বাহিনীর সেনাপতি নিজেকে বাদশাহ ভাবতে আরম্ভ করে আর তার মুজাহিদরা আত্মতুষ্টির ঢেকুর তুলতে শুরু করে তখন তাদের বাহুতে আর কোন শক্তি থাকে না।

তাদের খাপ খোলা তলোয়ারগুলো ঢুকে যায় খাপের ভেতর। তাদের মন থেকে হারিয়ে যায় জাতির সম্মান ও গৌরব রক্ষার আবেগ। তাদের অধপতন হতে হতে এই পর্যায়ে পৌঁছে যে, অবশেষে তারা নিজের ঈমানের দাবী পূরণেও আর সক্রিয় থাকে না। ধর্মকে তখন তারা ব্যবহার করতে শুরু করে প্রজাদের ধোঁকা দেয়ার কাজে। গোপনে শত্রুর সাথে হাত মিলিয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করে তারা। প্রজাদের উপর নিজেদের শাসন চালাতে ব্যবহার করে আল্লাহর নাম।

আমরা আজ ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষার জন্য আপন বাড়ী ঘরের মায়া ত্যাগ করে শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য

একত্রিত হয়েছি। আমরা ক্ষমতা ও সম্পদের মোহ থেকে নিজেদেরই কেবল মুক্ত করিনি, যারা ক্ষমতা ও সম্পদের পূজারী তাদের সমুচিত শিক্ষা দিয়ে জাতিকে মুক্ত করেছি তাদের কবল থেকে। এতদিন জাতির আস্তিনের ভেতর লুকিয়েছিল যে বিষধর সাপ আমরা তার মাথা গুঁড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছি। এখন যদি আমরা হেরে যাই তবে তার কারণ একটাই হবে, আর তা হলো আমাদের নিয়তের ক্রটি ও গন্ডগোল। এ জন্যই আমি আপনাদের ময়দানে পা বাড়াবার আগে এ ব্যাপারে সতর্ক করার প্রয়োজন বোধ করছি। আমরা যদি আমাদের নিয়তকে পরিচ্ছন্ন করতে পারি, আমি বিশ্বাস করি, আল্লাহর রহমত আমাদের বিজয়ের জামিনদার হয়ে যাবে।'

সুলতান আইয়ুবী এমন আবেগময় দীর্ঘ বক্তৃতায় অভ্যস্ত ছিলেন না। কিন্তু তিনি যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নিয়ে অভিযানে বেরোতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে সকলকে মানসিক ও আধ্যাত্মিকভাবে প্রস্তুত করার জন্য এ ভাষণ জরুরী হয়ে পড়েছিল।

উপস্থিত সবাই ছিলেন অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সেনাপতি ও কমান্ডার। এদের মধ্যে ছিলেন সেনাপতি মুজাফফরউদ্দিন। যিনি একজন যোগ্য ও বীর সেনাপতি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এক সময় তিনি সুলতানের সঙ্গ ছেড়ে তার বিরুদ্ধে চলে গিয়েছিলেন এবং সুলতানের বিরুদ্ধে লড়াইতেও অংশ নিয়েছিলেন। পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে আবার ফিরে এসেছেন সুলতানের বাহিনীতে। এ ছাড়া ছিলেন

সেনাপতি তকিউদ্দিন, আফজালউদ্দিন, ফররুখ শাহ এবং মালেক আদিলের মত বীর ও যোগ্য সেনাপতিবৃন্দ। এদের কেউ কেউ ছিলেন সুলতান আইয়ুবীর নিজ বংশের এবং রক্ত সম্বন্ধীয় আত্মীয়। আর ছিলেন সেনাপতি কাকবুরী, যিনি সুলতান আইয়ুবীর দক্ষিণ হস্ত রূপে পরিচিত ছিলেন। এদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যার কৌশল, দক্ষতা ও তেজস্বীতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। এমনি একদল সুদক্ষ সেনাপতি নিয়ে সুলতান আইয়ুবী ফিলিস্তিন অভিমুখে অভিযান চালাতে যাচ্ছিলেন। তার চোখের সামনে তখন ভাসছিল মুসলমানদের প্রথম কেবলা বায়তুল মোকাদ্দাস, যেখান থেকে আমাদের প্রিয় নবী মেরাজে গমন করেছিলেন।

এ অভিযান ছিল খুবই বিপদসংকুল ও ঝুঁকিপূর্ণ। ক্রুসেডদের সামরিক শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্বই কেবল বেশী ছিল এমন নয়, পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিক দিয়েও ক্রুসেড বাহিনী ছিল সুবিধাজনক অবস্থানে। ক্রুসেডাররা উল্লসিত ছিল এ জন্য যে, তারা তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট মজবুত ও সংহত করে নিতে পেরেছে। তারা নিজেদের মাটিতে থেকে যুদ্ধ করবে, ফলে তাদের রসদের ঘাটতি পড়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী তার এলাকা থেকে বহু দূরে যুদ্ধ করতে আসবে। অনেক বাঁধা মাড়িয়ে দীর্ঘ পথ তাদেরকে রসদপত্র বহন করে আনতে হবে।

যুদ্ধের স্বাভাবিক বিবেচনায় সামরিক কৌশলগত দিক থেকেও আক্রান্ত বাহিনীর চাইতে আক্রমণকারী বাহিনী থাকবে

বেকায়দায়। এ জন্য আক্রমণকারীর সৈন্য সংখ্যা আক্রান্ত বাহিনীর ছয়গুন না হলেও দ্বিগুণ তো অবশ্যই হওয়া উচিত। কিন্তু সুলতান আইয়ুবীর বাহিনী দ্বিগুণ তো দূরের কথা, সমানও ছিল না। বরং খৃস্টান বাহিনীর চাইতে অনেক কম সৈন্য নিয়েই সুলতানকে যুদ্ধযাত্রা করতে হচ্ছিল।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছিল, এ যুদ্ধ অনেক সময় নেবে। সুলতান পরাজয় মেনে না নিয়ে ঝটিকা আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত রাখবেন খৃস্টানদের। আর খৃস্টানরা উন্নত অস্ত্র, বিপুল রসদসম্ভার, অধিক সৈন্য আর আপন ভুবনে যুদ্ধ করার সুবিধার কারণে পরাজয় মেনে না নিয়ে একের পর এক প্রতিহত করে যাবে সুলতানের প্রতিটি আক্রমণ। এই মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই আইয়ুবীর সৈন্যরা তৈরী হচ্ছিল। তারা ভাবছিল, হয়তো দীর্ঘ দিন আর বাড়ী ফেরা সম্ভব হবে না। হয়তো এ জীবনে আর কোন দিনই বাড়ী ফিরতে পারবে না তারা। কিন্তু তাতে কোন আফসোস ছিল না তাদের।

সুলতান আইয়ুবীও তাদেরকে এ কথাটিই বুঝানোর চেষ্টা করছিলেন। তিনি সৈন্য ও সেনাপতিদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন, তারেক বিন জিয়াদের ইতিহাস। বলছিলেন, 'বিজয় ছিনিয়ে আনতে হলে আমাদেরও ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে সমস্ত নৌযানগুলো আগুন লাগিয়ে পুড়ে ফেলার মত সাহস ও হিম্মত রাখতে হবে। পিছু হটার সব পথ বন্ধ না করলে বিজয় আমাদের পদচুম্বন করবে না। এই অনুভূতি নিয়ে ময়দানে পা বাড়াতে হবে আমাদের, এটাই আমার জীবনের শেষ যাত্রা, আর

কোন দিন আমরা কেউ স্বদেশ ও স্বজনদের কাছে ফিরে আসতে পারবো না।'

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ তার স্মৃতিকথায় লিখেছেন, 'সুলতান আইয়ুবী বিশ্বাস করতেন, কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ও দুনিয়ায় আল্লাহর শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করা এমন ফরজ, যে দায়িত্ব আল্লাহ তাকে অর্পন করেছেন। আল্লাহ মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার যে আদেশ দান করেছেন এটাই তার জীবনের সবচে বড় ফরজ। এ দায়িত্ব দুনিয়ার সকল কাজের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। অধিকাংশ দেশ আল্লাহর আইনের শাসনে আনয়ন করা ও মানব জাতিকে আল্লাহর আনুগত্যে নিয়ে আসার চেষ্টা করাই একজন মুমিনের প্রকৃত কাজ। তিনি সমস্ত সৈন্য বাহিনীকে একত্রিত করে তাদের মধ্যে এই চেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছিলেন।

সুলতান আইয়ুবীর অন্তর দৃষ্টি ভবিষ্যতের আলো-অন্ধকার যেন পুরোটাই দেখতে পাচ্ছিলো। সেই আলোকে তিনি হাতিন অঞ্চলকেই আগামী যুদ্ধের মোক্ষম ক্ষেত্র বিবেচনা করলেন।

ফিলিস্তিনের এক অখ্যাত পল্লী ছিল হ্যতিন। কিন্তু সুলতান আইয়ুবীর সংকল্প ও পরিকল্পনার কারণে এই অঞ্চলটি পৃথিবীর ইতিহাসে নতুন মহিমা ও ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। খৃস্টান ঐতিহাসিকরা সুলতান আইয়ুবীর চিন্তা ও দূরদর্শিতা দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। ক্রুসেড বাহিনীর সম্মিলিত শক্তিকে হাতিন অঞ্চলে টেনে আনা, অভাবিত চাল ও রণ কৌশলের মাধ্যমে বিশাল খৃস্টশক্তিকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত ও ধ্বংস

করার মধ্য দিয়ে সুলতান আইয়ুবী নিজেকে এক দিগ্বিজয়ী সেনানায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। খৃষ্টান রাজন্যবর্গের সম্মিলিত বাহিনীর মাত্র একটি দল ছাড়া সব কয়টি দল এ যুদ্ধে পরাজয় বরণ করে এবং পরাজিত বাহিনীর অসংখ্য সৈন্য বন্দীত্ব কবুল করে নিজেদের আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়।

সামরিক বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ এ যুদ্ধে সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা বিভাগ এবং তার কমান্ডো বাহিনীর বিস্ময়কর তৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। বিশেষ করে বাকার বিন মুহাম্মদ ও কুলসুমের তৎপরতা ছিল অবিস্মরণীয়। বাকার মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়েও প্রয়োজনীয় গোপন তথ্য সংগ্রহ করে তা সুলতান আইয়ুবীকে পৌঁছে দিয়েছিল। কুলসুম রাজকীয় বিলাসিতা ও সুখের জীবন উপেক্ষা করে আইয়ুবীর সৈন্যদের জন্য গোপন তথ্য সরবরাহ করেছে। তারা এবং তাদের মতো অসংখ্য গোয়েন্দা, যাদের নাম মানুষের দৃষ্টির অন্তরালেই রয়ে গেছে, তাদের ত্যাগ, কোরবানী ও শাহাদাতের বিনিময়ে রচিত হয়েছে নতুন ইতিহাস। আল্লাহর রাহে জীবন বিলিয়ে দেয়ার তামান্না নিয়ে যেসব মুজাহিদ হাতিনের ময়দানে রক্ত দিয়েছে তাদের ত্যাগের বিনিময়ে হাতিনের মত নগন্য গ্রাম ইসলামের ইতিহাসে স্মৃতির নিদর্শন হয়ে আছে।

সুলতান আইয়ুবী সর্বদা জুম্মার দিনে তার অভিযানের সূচনা করতেন। কারণ এ দিনটিকে তিনি আল্লাহর অধিক পছন্দনীয় ও পবিত্র দিন মনে করতেন। এই পবিত্র দিনে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর কাছে নতজানু থাকে। যখন এই দিনে সৈন্যরা

অভিযানে বের হয় তখন সমগ্র জাতি আল্লাহর কাছে তাদের সফলতা কামনা করে দোয়া করতে থাকে।

হাতিনের ময়দানে যাওয়ার জন্যও তিনি জুমার দিন বেছে নিলেন। দিনটি ছিল ১১৮৭ সালের ১৫ মার্চ। সুলতান আইয়ুবী তার বিশাল বাহিনীর মাত্র একটি ব্যাটেলিয়ান সঙ্গে নিয়ে ক্রাকের কাছে ক্যাম্প করে বসলেন।

খৃস্টান গোয়েন্দারা দ্রুত এই খবর সম্মিলিত ক্রুসেড বাহিনীর কাছে পৌঁছে দিল। গোয়েন্দারা বললো, 'সুলতান আইয়ুবী ক্রাকের কাছে অবস্থান নিয়েছেন। সম্ভবত তিনি ক্রাক শহর অবরোধ করবেন।'

কিন্তু সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। এটা ছিল হজ্জের কাফেলা যাতায়াতের সময়। মিশর ও সিরিয়ার হজ্জ কাফেলাগুলো এই পথে যাতায়াত করতো। খৃস্টান দুর্বৃত্তরা এই সব কাফেলায় আক্রমণ চালাতো। এ সব আক্রমণ চালানো হতো ক্রাকের খৃস্টান সরকারের সহায়তায়। ক্রাকের সম্রাট শাহ আরনাত কুখ্যাত লুটেরা হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিল।

সুলতান আইয়ুবী চাচ্ছিলেন হজ্জ কাফেলাগুলো যেন নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে। এ জন্যই তিনি ক্রাকের কাছে গিয়ে অবস্থান নিলেন। তিনি জানতেন, তার এ উদ্দেশ্যের কথা খৃস্টানরা ধারনা করবে না। তারা ভাববে, সুলতান তাদের ওপর আক্রমণ করার জন্যই ওখানে অবস্থান নিয়েছেন। ফলে মুসলিম কাফেলায় আক্রমণ করার চিন্তা যেমন বাদ দেবে তেমনি আক্রান্ত না হওয়ায় তারা থাকবে অজানা আশঙ্কা ও

পেরেশানীতে। এতে দুশমনের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে।

ক্রাকের সন্নিকটে অবস্থান নেয়ায় সুলতানের দুটো উদ্দেশ্যই পূরণ হলো। ক্রুডেস বাহিনী সুলতানের চালাকি বুঝতে পারলো না। তারা ক্রাকের প্রতিরক্ষা জোরদার করার জন্য তাদের বাহিনীকে সদা প্রস্তুত অবস্থায় বসিয়ে রাখলো কেল্লার ভেতর। এদিকে হজ্জ কাফেলাগুলো নির্বিঘ্নে এগিয়ে গেল কাবার দিকে। সুলতান আইয়ুবী তার সেনাপতি ও কমান্ডারদের বুঝিয়ে দিলেন, কাফেলাগুলো চলে গেলে তাদের কি করতে হবে।

সুলতানের ক্রাক অবরোধের ব্যাপারটি ছিল বেশ মজার। একদিন গভীর রাতে ক্রাকের রাজমহলে হঠাৎ যেন ভুকম্পন শুরু হয়ে গেল। শাহ আরনাতকে মাঝরাতে জাগানো হলো। তাকে বলা হলো, সুলতান আইয়ুবী ক্রাক শহর অবরোধ করে বসেছেন। শহর প্রাচীরের বাইরে সুলতানের বিশাল বাহিনী ক্যাম্প করে বসেছে। শাহ আরনাত হতচকিত হয়ে উঠে বসলেন। ভীতচকিত কণ্ঠে বললেন, 'কি বললে? সুলতান আইয়ুবী শহর অবরোধ করেছেন?'

কুলসুম তখন তার পাশেই ছিল। সে শাহ আরনাতের সাথে দৌড়ে শহরের মেইন গেটে গেল। সেখানে দেয়ালের উপর উঠে দেখলো প্রাচীরের বাইরে নিরাপদ দূরত্বে শত শত মশাল জ্বলছে। বেশীর ভাগ মশালই নড়াচড়া করছে, অর্থাৎ সেখানে তাবু টানানো হচ্ছে। রাতের নিস্তব্ধতা ভেদ করে

ঘোড়ার চি হি হি শব্দ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

শাহ আরনাত আইয়ুবীর অবরোধ ঠেকাতে শহরের প্রাচীরের উপর সৈন্য সমাবেশ করলেন। শহরের মেইট গেটের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দৃঢ় করলেন। শাহ আরনাত ছুটাছুটি করে সৈন্যদের নানা রকম নির্দেশ দিচ্ছিলেন, কুলসুমের দিকে তার কোন খেয়াল ছিল না।

কুলসুম ফিরে গেল মহলে। শাহ আরনাতের রক্ষীরা তার নির্দেশে ছুটাছুটি করছিল। মহলের পাশে দাঁড়িয়েছিল শাহী গাড়ী। এ গাড়ীতে করেই কুলসুম প্রতিদিন ভ্রমণ করতে যায়। গাড়ীর পাশে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়েছিল বাকার বিন মুহাম্মদ। মোট কথা, ক্রাকের রাজমহলের প্রতিটি ব্যক্তিই তখন নিজ নিজ দায়িত্বে তৎপর ছিল।

কুলসুম আদেশের ভঙ্গিতে বললো, 'সায়বল! গাড়ী এদিকে আনো।'

বাকার যখন গাড়ী আনলো, তখন কুলসুম তার ওপর উঠে বসলো ও গাড়ী একদিকে চালাতে হুকুম দিল। শাহ আরনাতের অন্দর মহলের মেয়েরা সবাই ছুটে বাইরে বেরিয়ে এসেছিল। তারা মহলের পাশে দাঁড়িয়ে দেখছিল রক্ষীদের ছুটাছুটি। হঠাৎ তারা দেখতে পেলো, প্রিন্সেস লিলি গাড়ীতে উঠে গাড়ী চালককে গাড়ী চালাতে হুকুম করছে। তাদের মধ্যে এক মেয়ে রাগে দাঁত পিষে বললো, 'এ হতভাগী কোন মুসলমানের বেটি, অথচ সে নিজেকে রাজরাণী মনে করে। তাকে শায়েস্তা করতেই হবে।'

'সময় এসেছে।' অন্য এক মেয়ে বললো, 'সুলাতন আইয়ুবীর অবরোধ খুব শক্ত ও ভয়ংকর হয়। তিনি অগ্নিবান নিক্ষেপ করবেন। মেনজানিক দিয়ে পাথর নিক্ষেপ করবেন। তখন শহরের মধ্যে ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়ে যাবে। সে সময় আমরা ওই মুখপোড়া ডাইনীকে শায়েস্তা করতে পারবো। দেখবে দু'দিনেই তার দেমাগ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

'তুমি আর বাহাদুরী করো না। তুমি না বলেছিলে তোমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে যে জেনারেল তাকে দিয়ে ঐ মেয়ের দেমাগ ঠাণ্ডা করে দেবে? কই, কিছুই তো করতে পারলে না।' বললো অন্য আরেক মেয়ে।

'তিনি সুযোগ করে উঠতে পারেননি। এবার দেখো ঠিকই সুযোগ এসে যাবে।' আগের মেয়েটি বললো, 'আগামীকাল সন্ধ্যা নাগাদ শহরের কি অবস্থা হয় দেখে নিও। সম্রাট আর শাহজাদী লিলির দিকে তাকাবারও ফুসরত পাবে না।'

কুলসুম গাড়ী নিয়ে অপেক্ষাকৃত নিরিবিলি এক স্থানে পৌঁছলো। গাড়ী দাঁড় করিয়ে সে বাকারকে জিজ্ঞেস করলো, 'আমাদের কোন লোক ভেতর থেকে কি ফটক খোলার ব্যবস্থা করতে পারবে?'

'সময় মতো চেষ্টা করে দেখা যাবে।' বাকার বললো, 'এই সৈন্য বাহিনী আমাদের কিনা তা আমি নিশ্চিত নই। আমি বিস্মিত হচ্ছি এই ভেবে যে, যদি এরা আমাদের বাহিনীই হবে তবে তারা আগে কেন সংবাদ দেয়নি। সুলতান আইয়ুবী তো এমন ভুল করেন না। সকাল হলেই স্পষ্ট জানা যাবে, এ বাহিনী

আসলে কার?'

'যদি এরা সুলতানের বাহিনী হয় তবে কি আমরা এখান থেকে পালাতে পারবো?' কুলসুম জিজ্ঞেস করলো।

'সেটা অবস্থার ওপর নির্ভর করবে।'

'এই বিশৃংখল অবস্থায় আমি আরনাতকে সহজেই হত্যা করতে পারি।'

'এমন কাজ খবরদার করবে না।' বাকার বললো, 'সৈন্য শহরে প্রবেশ করার সময় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তিনি পালাতে না পারেন।'

'তাহলে আমি এখন কি করবো? এ অবস্থায় আমাদের কি কিছুই করণীয় নেই?'

'আছে। তবে তার আগে দেখতে হবে এটা সুলতানের বাহিনী কিনা? আর শাহ আরনাত কোন দিক থেকে কিভাবে অভিযান চালান তাও আমাদের দেখতে হবে।'

কুলসুম আবেগ ও উত্তেজনায় টগবগ করছিল। ঠিক কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না সে। তার অস্থিরতা লক্ষ্য করে বাকার বললো, 'এখন অবস্থা অন্য রকম হয়ে গেছে। আমি খবর পেয়েছিলাম তিনি সৈন্যদের নিয়ে গেলিলি সাগরের দিকে যাবেন। কিন্তু.....'

'কিন্তু তিনি ক্রাক অবরোধ করে ঠিক কাজই করেছেন। এখন আমাদের উচিত তাকে সহায়তা করা।'

'থামো। এতো উতলা হয়ো না। নিজেকে সংযত করো। কি করতে হবে সময় মতো আমি তোমাকে বলবো। চলো।

এখানে আর বেশীক্ষণ দেরী করা ঠিক হচ্ছে না।' বাকার বললো, 'চলো ফিরে যাই।'

এই হট্টগোলের মধ্য দিয়েই কেটে গেল রাত। প্রভাতের আলো ফুটতে শুরু করলো পূর্ব দিগন্তে। ক্রাকের প্রাচীরের উপর দূরপাল্লার কামানগুলো অগ্নিবর্ষণ করার জন্য মুখ হা করে বসেছিল। মেনজানিকগুলো প্রস্তুত হয়েছিল পাথর ও অগ্নিবান নিক্ষেপের জন্য। সৈন্যরা প্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল সম্রাট আরনাতের নির্দেশের অপেক্ষায়।

সম্রাট শাহ আরনাত প্রাচীরের উপর দাঁড়িয়ে তাকিয়েছিলেন সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীর দিকে। যখন তিনি দেখতে পেলেন ওখানে মুসলিম বাহিনীর নিশান উড়ছে তখন তিনি নিশ্চিত হলেন এটা সুলতান আইয়ুবীরই বাহিনী। কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না, সুলতান আইয়ুবী এই বাহিনীর সাথে আদৌ আছেন কি নেই।

তিনি বাহিনীর সজ্জা দেখে বিস্মিত হলেন। বাহিনীর সজ্জা মোটেও অবারোধের মত নয়। তারা তাবু টানিয়ে ক্যাম্প করেছে ঠিক, কিন্তু সৈন্যরা প্রতিদিনের মতো স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছে। হামলা করার কোন তৎপরতাই তাদের মধ্যে নেই।

সেদিনটি কেটে গেল নির্বিঘ্নে। কোন দিক থেকেই কোন হামলা হলো না। এভাবেই কাটলো আরও পাঁচটি দিন। আরনাতের অপেক্ষা অস্থিরতায় পরিণত হলো। কিন্তু তিনি জানতে পারলেন না, রাতে সুলতান আইয়ুবী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহন

করে তার বিশ্বস্ত কমান্ডো সৈন্যদের রাস্তায় দূর দূরান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়েছেন, যে রাস্তায় হাজীরা যাতায়াত করবে।

কয়েকদিন পর প্রথম কাফেলা আসতে দেখা গেল। এটি ছিল মিশরের কাফেলা। কমান্ডো অশ্বারোহীরা তাদের সাথে মিশে গেল। কাফেলা যখন সুলতান আইয়ুবীর তাবুর কাছে এসে পৌঁছলো, তখন সুলতান আইয়ুবী ছুটে গিয়ে হাজীদের সাথে দেখা ও মুসাফা করলেন। তিনি সম্মানের সাথে সবার হস্তচুম্বন করে হাজীদেরকে তাঁর ক্যাম্পে বিশ্রাম ও আহারের জন্য নিয়ে গেলেন। পরে কমান্ডো বাহিনীর পাহারায় তারা নিরাপদে ক্রাকের সীমানা অতিক্রম করলো। তার একদিন পরেই এলো সিরিয়ার কাফেলা। তাদেরকেও তিনি যথাসাধ্য আদর আপ্যায়ন করলেন। বিশ্রাম ও আহারাদির পর তাদেরও তিনি নিরাপদে ক্রাকের সীমানা পার করে দিলেন।

যে কোন সময় সুলতান আইয়ুবী হামলা করতে পারে এ আশঙ্কা নিয়ে কয়দিন ধরেই ক্রাক শহরের ভেতর খৃস্টান সৈন্যরা টানটান উত্তেজনা নিয়ে প্রস্তুত অবস্থায় অপেক্ষা করছিল। শহরের নাগরিকদের মধ্যে বিরাজ করছিল সীমাহীন ভীতি ও আতংক। সুলতান আইয়ুবীর গোয়েন্দা বিভাগ এই অবস্থায়ও সুলতানকে সম্রাট শাহ আরনাতের তৎপরতার খবর সরবরাহ করছিল অত্যন্ত গোপনে ও সুকৌশলে।

একদিন সকালে সম্রাট আরনাত খবর পেলেন, সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা চলে যাচ্ছে। আরনাত বিস্মিত হয়ে দেখলেন সে দৃশ্য। দুটি হজ্জ কাফেলা সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যদের

পাহারায় বিদায় হয়ে যাওয়া ছাড়া অবরোধকালীন সময়ে আর কোন ঘটনাই ঘটেনি। আরনাত এ রকম অবরোধের কোন কারণ বুঝতে পারলেন না। শুধু সুলতানের গোয়েন্দারাই জানতো আসল ব্যাপার, কিন্তু সে রহস্য জানার কোন উপায় ছিল না আরনাতের।

অবরোধ উঠিয়ে নেয়ার সময় সুলতান গোয়েন্দাদের জানিয়ে দিলেন সৈন্যদর নিয়ে তিনি কোথায় যাচ্ছেন। গোয়েন্দাদের তিনি বললেন, 'আমি যখন যেখানেই থাকি না কেন, ক্রাকের অবস্থা ও সম্রাট শাহ আরনাতের গতিবিধি সব সময় আমাকে অবহিত করবে।'

১১৮৭ সালের ২৭ মে সুলতান আইয়ুবী ইশতার নামক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করলেন। সেখানে মিশর ও সিরিয়ার সৈন্য বাহিনী গিয়ে সুলতান আইয়ুবীর সাথে মিলিত হলো। সুলতান আইয়ুবীর জ্যৈষ্ঠপুত্র মাত্র ষোল বছরের বালক আল আফজাল তার বাহিনী নিয়ে সুদক্ষ সেনাপতি মুজাফফরউদ্দিনের সাথে মিলিত হলো।

এভাবে সুলতানের সকল সৈন্য একত্রিত হলো ইশতারে। তিনি সমস্ত সেনাপতি ও কমাণ্ডারদের একত্রিত হওয়ার হুকুম দিলেন। ইশতারের ময়দানে সমবেত হলো সব সেনাপতি ও কমাণ্ডারবৃন্দ। তিনি তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে, আমার বন্ধুগণ! আল্লাহ আমাদের সাহায্য করুন। অন্তর থেকে প্রিয়জন ও গৃহের কথা ভুলে যাও। অন্তরে শুধু গেঁথে নাও আমাদের প্রথম কেবলা উদ্ধারের কথা। মনে মনে জপতে থাকো সেই

আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নাম, যিনি আমাদের উপর দায়িত্ব দিয়েছেন প্রথম কেবলা মুক্ত করার। মনে রেখো, আমরা পররাজ্য গ্রাস করতে যাচ্ছি না, আমরা যাচ্ছি আমাদের বোন ও কন্যাদের সম্ভ্রম রক্ষা করতে। কাফেরদের হাতে নির্যাতীত আমাদের ভাইদের উদ্ধার করতে।

এখন আমরা আমাদের স্বপ্ন নিয়ে আর কথা বলবো না, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়বো। আমরা জানি, আমাদের সৈন্য সংখ্যা শত্রুদের তুলনায় অনেক কম। খৃস্টান সম্রাটরা সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করবে আমাদের। তাদের বাহিনীর সাথে আছে হাজার হাজার নাইট, যাদের আপাদমস্তক লৌহ পোষাকে আবৃত। তাদের আছে উৎকৃষ্ট ঘোড়া ও অস্ত্র। তারা নিজেদের মাটিতে যুদ্ধ করবে বলে পাবে পরিবেশের সুবিধা। তাদের খাদ্য ও রসদপত্রের কোন ঘাটতি নেই। কিন্তু তাদের সাথে নেই আল্লাহর সাহায্য ও মজবুত ঈমানের শক্তি। এই শক্তি নিয়েই আমরা দাঁড়াবো বিশাল প্রতিপক্ষের সামনে। একদিকে সরাসরি শত্রুদের সাথে লড়াই করতে হবে আমাদের, অন্যদিকে দূর করতে হবে পরিবেশের বাঁধা।'

তিনি নকশা টানিয়ে তলোয়ারের মাথা দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন যুদ্ধের ময়দানে কোথায় কারা অবস্থান নেবে। বলছিলেন কিভাবে কোন পথে তারা পৌঁছবে নির্দিষ্ট জায়গায়। মূল লড়াইয়ের ক্ষেত্রটি দেখে চমকে উঠলেন সেনাপতিরা। তারা বিস্মিত হয়ে তাকালেন সুলতান আইয়ুবীর দিকে। সুলতান

আইয়ুবী তাদের বিস্মিত হবার কারণ বুঝে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, এটাই হাতিনের বিস্তীর্ণ অঞ্চল।'

সুলতান আইয়ুবী তাকালেন সেনাপতিদের দিকে। বললেন, 'তোমরা চিন্তা করছো এ তো এক শুকনো মরুভূমি! গাছের শুকনো ছালের মত কঠিন মাটি। উঁচু নিচু দুর্গম পাথুরে পর্বত। এখন সময়ও খুব খারাপ। প্রকৃতিতে চলছে কাটফাটা খরার মৌসুম। এই শুকনো মাটি মুহূর্তেই চুষে নেবে মানুষ ও পশুর রক্ত। আশপাশের উঁচু নিচু শুষ্ক টিলাগুলো পানির তৃষ্ণায় ভুগছে। রোদে এগুলো লোহার মত উত্তপ্ত হয়ে যায়। তোমরা ভাবছো, কেন আমি যুদ্ধের জন্য এমন কঠিন ময়দান বেছে নিলাম।

এর উত্তর খুব সোজা। খৃস্টান সৈন্যদের মধ্যে এমন কে আছে, যে এই জাহান্নামের এলাকায় যুদ্ধ করতে চাইবে? সে সৈন্য আমাদের আছে। আমাদের হালকা পাতলা সৈন্যরা এখানে ফড়িং-এর মত উড়তে থাকবে, চিতাবাঘের মত লাফাতে থাকবে। আর শত্রুরা? তারা লৌহশিরস্ত্রাণ ও লোহার পোষাক পরে ময়দানে নামবে। তাদের নাইট বাহিনীর জমকালো পোষাকগুলো তাদের টানবে মাটির দিকে। পোষাকের ভারে অল্পতেই তারা হাঁপিয়ে উঠবে।

রোদের তাপে তাদের লোহার পোষাকগুলো যখন আগুনের মতো গরম হয়ে যাবে তখন তার ভেতর তারা সেদ্ধ হয়ে মরবে। তাদের সুসজ্জিত বাহিনী অল্পতেই পিপাসা ও ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়বে। লোহার ভারে তাদের গতি হয়ে পড়বে শ্লথ।

তারা তখন চোখে শুধু সর্ষে ফুল দেখতে থাকবে। আর আমাদের জানবাজরা তাদের নাকের ডগা দিয়ে ছুটে বেড়াবে বিদ্যুৎবেগে।

আপনারা জানেন, আমি প্রত্যেক বিশেষ কাজ পবিত্র ও বরকতময় জুমার দিনে শুরু করি। আমরা সেই সময় অগ্রসর হবো যখন সকল মসজিদে আমাদের জন্য দোয়া ও প্রার্থনা শুরু হবে। মসজিদের ইমাম সাহেবানরা আমাদের বিষয়ে মুসল্লীদের সামনে ভাষণ দেবেন। তাদের বক্তৃতায় উদ্বেলিত হয়ে মুসল্লিরা আমাদের সফলতার জন্য আল্লাহর দরবারে প্রাণ খুলে দোয়া করবে। তাদের সেই দোয়ার বরকতে আমাদের ওপর নেমে আসবে আল্লাহর রহমত।

আজ সেই পবিত্র দিন। আমি প্রত্যেক গ্রাম ও এলাকায় খবর পাঠিয়ে দিয়েছি, সবাই যেন জুম্মার নামাজের পর মুজাহিদদের সফলতার জন্য দোয়া করে।'

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মানচিত্রের এক জায়গায় তলোয়ারের অগ্রভাগ স্পর্শ করে বললেন, 'এই দেখো, এটা গ্যালিলি সাগর। এখানে সাগরের সাথে মিশেছে নদী।' তিনি নকশার ওপর তলোয়ারের অগ্রভাগ সরিয়ে দেখাতে লাগলেন, 'আর এটা এ অঞ্চলের একমাত্র হ্রদ যেখানে পানি আছে। অবশিষ্ট বিল ঝিলগুলো শুকিয়ে গেছে। এটা সেই মাস, যাকে খৃষ্টানরা জুন মাস বলে। যখন সর্বত্র পানির জন্য হাহাকার পড়ে যায়। আমরা থাকবো শত্রু ও পানির মাঝামাঝি। আমরা শত্রুদের এই ময়দানে টেনে আনবো এবং তাদেরকে পানি

থেকে দূরে রাখবো। তাদেরকে আমরা এমন অবস্থায় ফেলবো যাতে তারা পিপাসায় ছটফট করতে করতে মারা যায়।

আমি জানি, শক্ররা সমর ক্ষেত্র হিসাবে হাতিনে এসে যুদ্ধ করতে আপত্তি করবে। কিন্তু আমরা তাদের এখানেই যুদ্ধ করাবো। আমাদের সেনাবাহিনীকে আমি চারটি ভাগে ভাগ করেছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, সেনাপতি মুজাফফরউদ্দিন ও আমার ছেলে আল আফজাল আমাদের কাছে নেই। তারা বিরাট এক বাহিনী নিয়ে গ্যালিলি সাগরের দক্ষিণে জর্দান নদী পার হয়ে গেছে। এই বাহিনী জাবালুত তাবুর পর্যন্ত পৌঁছবে। হয়তো এতোক্ষণে তারা সেখানে পৌঁছেও গেছে। এটা একটা ধোঁকা যা আমি শক্রদের দেখাচ্ছি।'

তিনি সৈন্যদের অবশিষ্ট তিনটি দলকে তাদের অবস্থান ও করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে বললেন। এই তিন বাহিনীরই একটি দলকে তিনি নিজের কমান্ডে বেছে নিলেন। ঐতিহাসিকদের মতে এই দলটি ছিল রিজার্ভ বাহিনী। এটা ছিল একটা চূড়ান্ত যুদ্ধের সিদ্ধান্ত ছিল।

এই তিনটি বাহিনীই পরিকল্পনা মতো বিভিন্ন স্থান দিয়ে নদী পার হলো। খৃষ্টানরা গোয়েন্দা মারফত সুলতানের এসব বাহিনীর অগ্রগতির সংবাদ নিয়মিতই পাচ্ছিল। কিন্তু তারা জানতে পারলো না, সুলতান আইয়ুবীর প্রকৃত প্ল্যানটি কি? সুলতান আইয়ুবী গ্যালিলি সাগরের পশ্চিম পাড়ে তিবরিয়া নামক এক পাহাড়ে আরোহন করলেন।

খৃষ্টানদের জন্য আরও একটি বিপদ ওঁৎ পেতে ছিল।

নিয়মিত বাহিনীর চাইতেও সুলতান গোয়েন্দা ও কমাণ্ডোদের বিশেষভাবে কাজে লাগাতেন প্রতিটি যুদ্ধে। সুলতান আইয়ুবীর এসব কমাণ্ডো বাহিনীর অবস্থান ও অগ্রগতি সম্পর্কে মোটেই ধারনা ছিল না খৃস্টানদের। এই বাহিনীর অল্প সংখ্যক সৈন্য বিশাল বাহিনীর ওপর অতর্কিতে আঘাত হানতো। 'আঘাত করো আর পালিয়ে যাও' এই ছিল তাদের যুদ্ধনীতি।

খৃষ্টানরা সুলতানের এই ধরনের যুদ্ধ সম্পর্কে অবহিত ছিল। তাই তাদের অস্তিত্ব টের না পেলেও এ ধরনের যুদ্ধের জন্য তারা প্রস্তুত ছিল।

মুজাফফরউদ্দিন ও আল আফজালের নেতৃত্বাধীন সৈন্যরা খৃষ্টানদের সেনা ফাঁড়ির ওপর কমাণ্ডো স্টাইলে আঘাত শুরু করলো। তাতে খৃষ্টানদের ধারণা হলো, এরাই সুলতান আইয়ুবী কমাণ্ডো সেনা এবং সুলতান আইয়ুবী এবারও এই বিশেষ ধরনের যুদ্ধই চালাবেন। কিন্তু অচিরেই তারা উপলব্ধি করলো, সুলতান আইয়ুবী কৌশল পাল্টানোয় ওস্তাদ। তার কমাণ্ডো বাহিনী নিত্যনতুন ও অভিনব সব পদ্ধতি ব্যবহার করতে শুরু করলো এই যুদ্ধে।

সুলতানের বাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্য খৃষ্টান সৈন্যরা শহরের বাইরে এসে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সুলতান আইয়ুবী ক্ষিপ্রগতিতে সৈন্য চালনা করলেন। যে পাশে গ্যালিলি সাগর ও পানির উৎস ছিল প্রথমেই তিনি তা দখল করে নিলেন।

খৃস্টান বাহিনীর একটি দল সিফুরিয়া নামক স্থানে সমবেত

হলো। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী তাদের দিকে অগ্রসর না হয়ে তিবরিয়া শহরের দিকে পিছু হটলেন এবং তিবরিয়ার কাছে ক্যাম্প করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন।

এর মাধ্যমে তিনি আসলে খৃস্টানদেরকে হাতিনের ময়দানের দিকে টেনে আনতে চাইলেন। ক্রুসেড বাহিনী তার চাল বুঝতে না পেরে থমকে দাঁড়িয়ে গেল। খৃস্টানরা অগ্রসর হচ্ছে না দেখে তিনি তার পদাতিক বাহিনীর কিছু সৈন্যকে এগিয়ে গিয়ে হামলা করতে বললেন খৃস্টান বাহিনীর ওপর। তারা এগিয়ে গেল খৃস্টান বাহিনীর দিকে। এই অবসরে সুলতান নিজে একটি ক্ষুদ্র অশ্বারোহী দল নিয়ে তিবরিয়ার ওপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালালেন। তিনি কমাণ্ডো বাহিনীর একটি দলকে আদেশ দিলেন, 'তিবরিয়াকে ধ্বংস করে দাও, শহরে আগুন ধরিয়ে দাও।' তার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করা হলো।

তিবরিয়ার সেনা ছাউনি ও কেল্লা শহর থেকে সামান্য দূরে ছিল। সেখানে খৃস্টানদের অল্প সংখ্যক সৈন্যই মজুত ছিল। শহর বাঁচানোর জন্য সৈন্যরা কেল্লা ছেড়ে বাইরে এলো। তারা শহর উদ্ধারে এগিয়ে এলে সুলতান আইয়ুবী তাদের পথ রোধ করে দাঁড়ালেন। শহর রক্ষার আশা ছেড়ে দিয়ে তারা মুখোমুখি হলেন সুলতান আইয়ুবীর।

খৃস্টানদের যে সৈন্যরা কেল্লা থেকে বেরিয়ে এসেছিল তার কমান্ড করছিলেন সম্রাট রিমান্ড। তিবরিয়ার উপত্যকায় সম্রাট রিমান্ড ও সুলতান আইয়ুবীর মধ্যে শুরু হলো সামনাসামনি তুমুল লড়াই।

কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ তার সচক্ষে দেখা যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, 'দু'দল সৈন্যই অশ্বে আরোহন করে একে অপরের ওপর প্রবল আক্রমণ চালালো। সামনের অশ্বারোহী দল তীর চালিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। তাদের পেছনে অগ্রসর হচ্ছিল পদাতিক বাহিনী। সুলতানের বাহিনী এতো তীব্র গতিতে অগ্রসর হলো যে, খৃস্টান বাহিনীর চোখের সামনে ভয়াল মৃত্যু নাচতে লাগলো। মুসলমানদের পিছনে নদী ও সামনে শত্রু, তাই পিছনে সরে যাওয়ার কোন সুযোগ ছিল না তাদের। সে রকম কোন ইচ্ছেও ছিল না তাদের। তাই মুসলমানদের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী মার মার কাট কাট রবে আক্রমণ চালালো। সে আক্রমণের তীব্রতা এত প্রকট ছিল যে তা আমি ভাষায় বর্ণনা করতে অক্ষম।'

দিনভর যুদ্ধ চললো। রাতেও মুসলিম কমান্ডো বাহিনী খৃস্টানদের অতিষ্ঠ করে রাখলো। খৃস্টান সৈন্য এবং তাদের ঘোড়াগুলো সারাদিনের যুদ্ধে ছিল পিপাসায় কাতর। কিন্তু পানির উৎস মুসলমানদের অধিকারে থাকায় রাতেও একটু পানি তারা পান করার জন্য পেলো না। খৃস্টান সৈন্যরা যতোবার পানির কাছে যেতে চেয়েছে ততোবারই সুলতানের কমান্ডো বাহিনী তাদের বাধ্য করেছে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে।

পরের দিন। খৃস্টান বাহিনী টিকতে না পেরে পেছনের টিলার দিকে সরে গেল। তারা টিলার ওপর উঠে যুদ্ধ করেই বুঝলো, এতোক্ষণে তারা কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে যেতে পেরেছে। মুসলমান সৈন্যরা তখনো ঝাঁকে ঝাঁকে তীর ছুঁড়ছে।

তাদের আক্রমণে বিন্দুমাত্র ঢিল পড়েনি। কিন্তু খৃস্টানরা উঁচুতে থাকায় তারা অধিক সুবিধা পাচ্ছিল।

মুসলমান সৈন্যরা হালকা পোষাকে থাকায় তারা টিলা অবরোধ করে এবার উপরে উঠতে শুরু করলো। তীরন্দাজ বাহিনীর ছত্রছায়ায় পদাতিক বাহিনী টিলার ওপর তরতর করে উঠে যাচ্ছে। তাদের মাথার উপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে তীরের বন্যা। হঠাৎ ক্রুসেড বাহিনী দেখলো, টিলার ওপর তাদের কমান্ডারের পতাকা দেখা যাচ্ছে না।

তারা ভাবলো, তবে কি সম্রাট রিমান্ড যুদ্ধের ময়দান থেকে পালিয়ে গেলেন? কিন্তু তিনি তো ক্রুশে হাত রেখে শপথ করেছিলেন, যুদ্ধের ময়দানে পিঠ দেখাবেন না। আক্রমণের প্রচন্ডতা দেখে আমাদের রেখেই তিনি পালিয়ে গেলেন? এই চিন্তা মনে জাগতেই তারাও পালানোর সুযোগ খুঁজতে লাগলো।

কিন্তু মুসলমান সৈন্যরা টিলাটি ঘিরে ফেলায় খৃস্টান সৈন্যরা পালাবারও পথ পাচ্ছিল না। তারা তখন টিলার উপরে থেকেই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ শুরু করলো। তাদের তখন একমাত্র চিন্তা, কি করে নিজেকে বাঁচানো যায়। উঁচু স্থানে থাকায় তারা তুলনামূলকভাবে কম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল।

সে দিনটিও অতীত হয়ে গেল। রাতে মুসলমান সৈন্যরা শুকনো ঘাস ও খড়ি সংগ্রহ করে খৃষ্টান সৈন্যদের আশেপাশে আগুন ধরিয়ে দিল। টিলার শুকনো ঘাসে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। ক্রমে চারদিক থেকে আগুন তাদের ঘিরে ধরতে

গুরুত্বপূর্ণ বন্দী আনা হয়েছে।'

'সে কে?'

'বন্দীর নাম হরমন।'

'কোন হরমন?' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'খৃষ্টানদের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান? যেমন আমাদের আলী বিন সুফিয়ান?'

'জ্বী, সম্ভবত তিনিই।'

'ঠিক আছে, তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

ঘটনা প্রবাহে সম্রাট হরমনের নাম আমরা অনেক বার শুনেছি। এ লোক ষড়যন্ত্র ও কুটনীতিতে খুবই পারদর্শী ছিল। যেসব ইহুদী ও খৃস্টান মেয়েরা মুসলমান এলাকায় গোয়েন্দাগিরী করতে আসতো তাদেরকে ভাল মতো ট্রেনিং দিতেন এই হরমন। তিনি একদল খৃস্টান মেয়েকে ট্রেনিং দেয়ার জন্য আক্রায় অবস্থান করছিলেন। কিন্তু আক্রার পতনের পর শহর ছেড়ে পালাবার সময় সবাই দলসহ ধরা পড়ে যায়।

তিনি এবং তার সঙ্গের মেয়েরা গোপনে শহর থেকে পালাচ্ছিল। দলটিকে দেখে সুলতান আইয়ুবীর এক গোয়েন্দার সন্দেহ হয়। সে তাদের পিছু নেয়। ফটকে পৌঁছলে রক্ষীদের জানায় সে তার সন্দেহের কথা। এক গোয়েন্দা কমাণ্ডার এগিয়ে যায় দলটির দিকে। হরমন তখন ছদ্মবেশে ছিল। তারপরও তাকে দেখেই চিনতে পারে সেই কমান্ডার।

হরমন তখন গ্রাম্য কৃষকের ছদ্মবেশে ছিল। মেয়েরাও কৃষক কন্যার মতোই পোষাকে পরে ফিরে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আনাজ-তরকারী বিক্রি করতে এসে তারা শহরে আটকা

পড়ে যায়। এখন সুযোগ পেয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে আপন গাঁয়ে।

গোয়েন্দা কমান্ডার বললো, 'তুমি খুব দামী উপহার জোগাড় করেছো। এসো, এক্ষুণি ওদের পাকড়াও করতে হবে।'

কমান্ডার কয়েকজন রক্ষী সৈন্যের সহযোগিতা নিয়ে হরমন ও তার সঙ্গীদের কাফেলাটিকে ঘিরে ফেললো। সম্রাট হরমনের সঙ্গে মেয়েদের দলটিই শুধু ছিল না, সঙ্গে সোনাদানাও ছিল প্রচুর। হরমন কমান্ডারের সামনে সোনার পুটলি মেলে ধরে কমান্ডার ও সৈন্যদের লক্ষ্য করে বললো, 'তোমরা এই সোনা ভাগ করে নাও এবং যে মেয়েকে তোমাদের পছন্দ হয় নিয়ে যাও, আমাকে এবং বাকী মেয়েদের ছেড়ে দাও।'

'আমাদের যে সব কটা মেয়েই পছন্দ!' কমান্ডার বললো, 'আমরা সব কটা মেয়েকেই নেবো, সমস্ত সোনাদানাও নেবো, সঙ্গে আপনাকেও সাথে নিয়ে যাবো।'

'ঠিক আছে, তোমরা সব কটা মেয়েকেই নাও, সোনাদানাও নিয়ে যাও, শুধু আমাকে ছেড়ে দাও।'

'তা কি করে হয়? আমার যে আপনাকেই সবচে বেশী পছন্দ হয়।' কমান্ডার রহস্যময় কণ্ঠে বললো হরমনকে।

কমান্ডার হরমনসহ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান আইয়ুবীর দরবারে হাজির হলো। সমস্ত সোনাদানা ও মেয়েদেরকে সুলতান আইয়ুবীর কাছে বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিল কমান্ডার।

সম্মিলিত খৃস্টান গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান সম্রাট হরমন সুলতান আইয়ুবীর কাছে ছিলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েদী।

শত্রু সেনারা যখন হাতিন প্রান্তরে এলো, তারা জানতেও পারলো না কি ভয়ংকর ফাঁদে তারা পা দিয়েছে। সুলতান আইয়ুবী তার বাহিনীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে কারা কখন একশনে যাবে বুঝিয়ে দিলেন।

কমান্ডো বাহিনীর গোয়েন্দা শাখার ওপর দায়িত্ব পড়লো শত্রু সেনাদের গতিবিধির ওপর নজর রাখার। কমান্ডো বাহিনীর ওপর দায়িত্ব পড়লো খৃস্টানদের সেনা ফাঁড়িগুলোর নিয়ন্ত্রণ, তাদের রসদপত্র আমদানীর পথে বাঁধা সৃষ্টি এবং রাতে শত্রু সেনাদের ব্যতিব্যস্ত রাখার। এসব কমান্ডোরা খৃস্টানদের মুহূর্তের জন্যও বিশ্রামের সুযোগ দিত না। এমনকি খৃস্টান সেনাপতি যে তার কমান্ডারদের সাথে একটু পরামর্শ করবেন সে সুযোগও পেতেন না তিনি।

১১৮৭ সালের ৪ জুলাই। সুলতান আইয়ুবীর মধ্য ভাগের সৈন্যরা খৃস্টানদের ওপর সরাসরি আক্রমণ চালালো। হাতিন ময়দানের চারপাশে ছিল বিরাট বিরাট মাটির টিলা। ক্রমেই খৃস্টানদের জন্য ময়দান সংকীর্ণ হয়ে আসতে লাগলো। ক্রুসেড বাহিনী কোন দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলেই মুসলমানদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল ছুটে যেতো তাদের সামনে। তারা এমন তীব্র গতিতে আক্রমণ করতো যে খৃস্টানদের গতি তাতেই রুদ্ধ হয়ে যেতো।

সুলতান আইয়ুবীর তীরন্দাজ বাহিনী উঁচু টিলার ওপর অবস্থান নিয়েছিল। তারা সেখান থেকে খৃস্টানদের ওপর তীর বর্ষণ শুরু করলো। সুলতান আইয়ুবীর অবস্থা এমন ছিল, তিনি

কখনও উপরে যেতেন, কখনও নিচে নেমে আসতেন।

গোয়েন্দা বাহিনী প্রতি মুহূর্তে ময়দানের প্রতিটি খবর সুলতানকে পৌঁছে দিচ্ছিল। খৃষ্টান নাইট ও সৈন্যরা লৌহ পোষাকের ভেতর পুড়ে মরছিল। তাদের ঘোড়াগুলোও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়েছিল। দূরে, নদীর বুকে তারা দেখতে পাচ্ছিল টলটলে স্বচ্ছ পানি। সেই পানি তাদের পিপাসা আরও বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

ক্রুসেড বাহিনী নিরূপায় হয়ে শেষ চেষ্টা হিসাবে প্রবল আক্রমণ চালালো। তখনো আইয়ুবীর বাহিনীর তুলনায় সংখ্যায় তারা অনেক। এই সংখ্যাশক্তির কারণে তখনো তারা বিজয়ের স্বপ্ন দেখছিল।

সুলতান আইয়ুবী খৃস্টানদের এ আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য নতুনভাবে সৈন্য সাজালেন। চাঁদের মতো অর্ধ বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে গেল মুজাহিদরা। শত্রুরা সোজা সামনে ছুটে এলো। তকিউদ্দিন তার বাহিনী নিয়ে চলে গেলেন খৃস্টানদের পেছনে। এতে খৃস্টানরা পূর্ণ গোলচক্রে ঘেরাও হয়ে পড়লো।

এবার চারদিক থেকে মুসলমানরা টুটে পড়লো ওদের ওপর। খৃস্টানদের প্রবল তোড়ের মুখে সামনের দিকটা ফাঁকা হয়ে গেল। পানির কাছে যাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল খৃস্টান বাহিনী। সামনের দিক ফাঁকা পেয়ে তারা ছুটলো সেদিকে। মুহূর্তে দু'পাশের পাহাড় থেকে শুরু হলো তীরবৃষ্টি। টিলার আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো কমান্ডো বাহিনী। তীরের আওতা থেকে বেঁচে যারা সামনে এগিয়ে গেল তারা পড়লো

দুর্ধর্ষ কমান্ডোদের কবলে। অশ্বারোহী কমান্ডোরা তাদের নির্বিচারে হত্যা ও পদদলিত করতে লাগলো।

চারদিক থেকে আক্রান্ত হওয়ায় সামনে অগ্রসর হওয়ার গতি স্তিমিত হয়ে এসেছিল ক্রুসেডারদের। টিলার ওপর থেকে অনর্গল তীর বর্ষিত হওয়ায় ময়দানে লুটিয়ে পড়ছিল আহত সৈন্য ও ঘোড়া। তারা পিষে যাচ্ছিল সহযোদ্ধাদের ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের নিচে। চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে গেল ক্রুসেড বাহিনী। যুদ্ধের অবস্থা তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতেই ক্রুসেড বাহিনী আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ শুরু করলো।

তারা আশা করছিল, শহর ও আশপাশের ফাঁড়ি থেকে যে কোন সময় তাদের জন্য সাহায্য এসে যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা তাদের জানা ছিল না। সুলতানের কমান্ডো বাহিনী আগেই আশপাশের ফাঁড়িগুলো দখল করে নিয়েছিল। বাইরে থেকে সাহায্য আসার সব কয়টি পথ তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। রসদ আসার প্রতিটি পথে তারা ওঁৎ পেতে ছিল। ফলে কোথাও থেকে কোন সাহায্য-পাওয়ার সুযোগ ছিল না খৃস্টানদের।

হাতিনের যুদ্ধ ক্ষেত্রে বাইরে থেকে কোন সাহায্য না আসায় ক্রমেই খৃস্টানদের মনোবল ভেঙ্গে পড়তে লাগলো। মুসলিম বাহিনীর ছোট ছোট দলের বেপরোয়া আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো ওরা।

সৈন্যদের মনোবল অটুট রাখার জন্য 'মহান ক্রুশের রক্ষক' আক্রার পাদ্রী, যিনি খৃস্টবিশ্বে বিশপের দায়িত্ব পালন করছিলেন, রণক্ষেত্রের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছুটাছুটি করছিলেন।

ক্রুসেড যুদ্ধের ইতিহাসে এই পাদ্রীর অবদানকে খৃস্টানরা সব সময় শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে। পাদ্রী নিজে ময়দানে উপস্থিত হয়েছিলেন সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য। তিনিই মুসলমান ও ইসলামকে নিঃশেষ করর জন্য ক্রুসেড বাহিনীকে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন। খৃস্টান সম্রাট থেকে শুরু করে প্রতিটি নাইট ও সেনা সদস্যকে মহান ক্রুশ স্পর্শ করে শপথ বাক্য পাঠ করতে হয়েছে। খৃস্টজগতে আক্রার এ ক্রুশ ছিল সবচে সম্মানিত ও মর্যাদাবান। শপথের পর সেই ক্রুশের একেকটি ক্ষুদ্র সংস্করণ প্রতিটি সৈনিকের গলায় পরিয়ে দেয়া হয়েছে। পাদ্রী সেই মহান ক্রুশটিও সাথে করে যুদ্ধের ময়দানে নিয়ে এসেছিলেন।

তিনি যখন দেখলেন খৃস্টান সম্রাট ও সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়ার পায়তারা করছে, তখন তিনি খুবই পেরেশান ও বিচলিত হলেন। তিনি সেই বিশাল ক্রুশ দেখিয়ে সৈন্যদের মনোবল বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছিলেন।

সম্রাট গে অব লুজিয়ান তার দুই সঙ্গীর সাথে পালিয়ে যাচ্ছিলেন, মুসলমান অশ্বারোহী দল তাকে দেখতে পেয়ে জীবিত বন্দী করে ফেললো।

প্রচন্ড যুদ্ধের পর পরাজিত হলো খৃস্টান বাহিনী। যুদ্ধে আক্রার পাদ্রী মারা গেলেন। বিশাল ক্রুশটি মুসলমানদের হাতে এসে পড়লো। সুলতান আইয়ুবী বায়তুল মোকাদ্দাস বিজয় করার পর সেই বিশাল ক্রুশটি সেখানকার এক গির্জার পাদ্রীর কাছে সসম্মানে জমা দিয়ে দেন।

সেদিন সন্ধ্যার আগেই হাতিন রণাঙ্গনের লড়াই শেষ হয়ে গেল। ক্রুসেড বাহিনীর ক্ষতির কোন পরিমাপ ছিল না। কত সৈন্য মারা গেছে তার হিসাব নেয়ারও কেউ ছিল না। শেষ পর্যন্ত যারা বেঁচে ছিল তারা অস্ত্রসমর্পন করে বন্দীত্ব কবুল করে নিল।

সুলতান আইয়ুবীর সামনে যখন যুদ্ধ বন্দীদের হাজির করা হলো তিনি বিস্মিত হলেন। সম্রাট রিমান্ড ছাড়া সকল খৃস্টান সম্রাটই বন্দী হয়েছিল এই যুদ্ধে। এদের মধ্যে ছিল ক্রাকের সম্রাট শাহ আরনাতও। আরনাতকে সুলতান আইয়ুবী নিজ হাতে হত্যা করার কসম খেয়ে ছিলেন।

যুদ্ধবন্দীদের সুলতান আইয়ুবীর সামনে হাজির করা হলে খৃষ্টান সম্রাট জেফ্রেকে সুলতান আইয়ুবী ঠান্ডা শরবত দান করলেন। এর মানে হচ্ছে, মুজাহিদদের রক্তে হাত লাল করার পরও সুলতান তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। অসংখ্য মুসলিম সৈন্যের হত্যাকারী জেফ্রেকে তিনি মৃত্যুদন্ড দেবেন না। এটা ছিল তৎকালীন প্রচলিত যুদ্ধনীতি। কোন বন্দীকে শরবত পান করানোর মানেই হচ্ছে তিনি অনুকম্পা লাভের সুযোগ পাবেন।

সম্রাট জেফ্রে সুলতানের ব্যবহারে বিস্মিত ও অভিভুত হয়ে সুলতানের হাত থেকে শরবতের পেয়ালা গ্রহণ করলেন। তিনি অর্ধেক শরবত পান করে বাকী অর্ধেক শরবতসহ পেয়ালাটি তার পাশে দাঁড়ানো শাহ আরনাতের দিকে এগিয়ে ধরলেন।

আরনাত পেয়ালা হাতে নিয়ে শরবত পান করা শুরু করতেই সুলতান আইয়ুবী গর্জন করে জেফ্রেকে বললেন,

'শরবত আমি আপনাকে দিয়েছি, ওকে দেইনি। ওকে জীবন ভিক্ষা দেয়ার কোন সিদ্ধান্ত আমি নেইনি। ওকে বলে দিন, এ শরবত আমার পক্ষ থেকে নয় বরং আপনার কাছ থেকে সে পেয়েছে।'

আরবদের প্রথা অনুযায়ী যাকে জীবন ভিক্ষা দেয়া হয় তাকে ঠান্ডা শরবত পান করানো হয়। শাহ আরনাতকে শরবত পান করতে দেখে সুলতানের চোখ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠলো।

সুলতান আইয়ুবী তার এক সেনাপতিকে বললেন, 'যুদ্ধবন্দীদের ভালমত মেহমানদারী করো। তাদের খানাপিনার ব্যবস্থা করো।'

যুদ্ধবন্দীদের মেহমানদারীর হুকুম জারী করেই সুলতান তার তাবুতে ঢুকে গেলেন। বন্দীদের সামনে খাবার পরিবেশন করা হলো। তারা যখন খেতে শুরু করেছে সে সময় সুলতান আইয়ুবী সম্রাট জেফ্রে ও শাহ আরনাতকে তাঁর তাবুতে ডেকে পাঠালেন।

তারা সুলতানের তাবুতে প্রবেশ করলে তিনি শাহ আরনাতকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুমি আমাদের রাসুল (সা.)কে সর্বদা গালমন্দ করো। তাঁর শানে অপমানজনক কথা বলো। তুমি বহুবার আমাদের হজ্জ কাফেলায় আক্রমণ করেছো। অসহায় নিরীহ মুসলমানদের হত্যা করেছো। নারীদের সতীত্ব লুণ্ঠন করেছো। এমনকি মাসুম শিশুরাও তোমার হত্যাযজ্ঞ থেকে রেহাই পায়নি। আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার অপরাধ ক্ষমা করা গেলেও নিরীহ মানুষ হত্যার অপরাধ

আমি ক্ষমা করতে পারি না। শুধুমাত্র একটি শর্তে তোমাকে ক্ষমা করা যায়। তুমি তোমার অতীত পাপের জন্য তওবা করে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে। আর ইসলাম গ্রহণ করে ভবিষ্যতে কখনো এ ধরনের অপরাধ করবে না বলে ওয়াদা করবে।'

সম্রাট শাহ আরনাত ইসলাম গ্রহণ করতে সরাসরি অস্বীকার করে বললো, 'সম্রাট হয়ে আরবের এক রাখাল বালকের দ্বীন গ্রহণ করতে বলো আমাকে? আমার আনুগত্য পাওয়ার কি যোগ্যতা আছে তার?'

সুলতান আইয়ুবী দ্বিধাহীন চিত্তে দ্রুত তলোয়ার বের করে এক আঘাতে তার একটি বাহু দেহচ্যুত করলেন। গর্জন করে বললেন, 'শয়তান! তুই আমার রাসূলকে গালি দিস, আল্লাহর দোস্তকে অপমান করিস! এত বড় স্পর্ধা তোর? যদি গালি তুই আমাকে দিতি তাহলেও তুই বাঁচতে পারতি। কোন ঈমানদার নবীর অপমান সহ্য করে না। তোর মতো জালিমের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদন্ড।'

ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, সে সময় সুলতান আইয়ুবীর পাশে কয়েকজন সেনাপতি অবস্থান করছিলেন। তারা আরনাতকে বাইরে নিয়ে হত্যা করলো। সুলতান ঘৃণার স্বরে বললেন, 'ওর লাশ বাইরে রাস্তার ওপর ফেলে রাখো।'

সম্রাট জেফ্রে যখন তার সঙ্গীর এমন অবস্থা দেখলেন, তখন তাঁর চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। তিনি মনে করলেন, এবার বুঝি তাকে হত্যা করা হবে।

সুলতান আইয়ুবী তার এমন অবস্থা দেখে সম্রাট জেফ্রের কাছে গিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে শান্তভাবে বললেন, 'কোন শাসক অন্য শাসককে হত্যা করে না। কিন্তু তার পাপ এত বেশী ছিল যে, তাকে হত্যা না করে আমার উপায় ছিল না। আমি তাকে হত্যা করার শপথ নিয়েছিলাম। আপনি ভয় পাবেন না।'

সুলতান বন্দীদের তাবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন। বললেন, 'সাধারণ বন্দীদেরকে একত্রে রাখো। নাইটদের জন্য আলাদা তাবুর ব্যবস্থা করো। সম্রাটদের জন্য তাবু খাটাও আমার তাবুর পাশে। প্রত্যেককে স্বসম্মানে যার যার মর্যাদা অনুযায়ী রাখার ব্যবস্থা করো। কেউ যেন নিজেকে অপমানিত না ভাবে।'

বন্দীদের জন্য তাবু খাটানো শুরু হলো। সুলতান আইয়ুবী সিজদায় পড়ে গেলেন। বললেন, 'হে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। এ কেবল তোমারই শান। এ বিজয়ের সমস্ত কৃতিত্বই একান্ত তোমার। তুমি তোমার দ্বীনের জন্য যারা জীবন দিল তাদের শাহাদাতকে কবুল করো।'

ক্রাকের রাজ প্রাসাদ। গভীর রাত। সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিতে বিরাজ করছে সুনসান নিস্তব্ধতা। মহলে শাহ আরনাত নেই। তার সেনাপতি ও মন্ত্রীরাও কেউ নেই। সেখানে আছে শুধু মহলের মেয়েরা। কুলসুম ও তার চাকর চাকরানীরা মহলেই ছিল। পাশে রক্ষীদের ছাউনিতে ছিল কিছু সংখ্যক রক্ষীসেনা।

তখনও মহলে সম্রাট শাহ আরনাতের মৃত্যু সংবাদ

পৌঁছেনি। রাতের প্রথম প্রহর শেষ হয়েছে। সবাই জানে, কুলসুম ঘুমিয়ে আছে নিজের কামরায়।

এক নারী লঘু পায়ে কুলসুমের কামরায় প্রবেশ করলো। তার হাতে খঞ্জর। সে কুলসুমের পালংকের কাছে গেল। কামরায় কোন আলো ছিল না। মহিলাটি আন্দাজের ওপর ভর করে খঞ্জর উপরে তুলে পূর্ণ শক্তিতে নামিয়ে আনলো নিচে। কিন্তু কোন চিৎকারের শব্দ শোনা গেল না। খঞ্জরের আঘাত পালংকের গদিতে বিদ্ধ হয়ে খচ করে শব্দ হলো মাত্র। মহিলাটি বিস্মিত হয়ে বিছানার চাদরে হাত রাখলো, সেখানে কুলসুম নেই। মহিলাটি ভাবলো, কুলসুম হয়তো বাথরুমে গেছে, এক্ষুণি ফিরে আসবে। সে পালংকের পাশে ওঁৎ পেতে বসে রইলো।

একটু পর আলতো পায়ে কেউ কামরায় প্রবেশ করলো। পদশব্দ পালংকের কাছে এসে থেমে গেল। ওঁৎ পেতে থাকা মহিলা অন্ধকারেই দ্রুত উঠে খঞ্জর দিয়ে আঘাত করলো আগন্তুককে। নারীকণ্ঠের চিৎকার খান খান করে দিল রাতের নিস্তব্ধতা। তৎক্ষণাৎ আগন্তুক মহিলা তার খঞ্জর সামনের ছায়ামুর্তির পেটে চেপে ধরলো পূর্ণশক্তিতে। খঞ্জর আমূল ঢুকে গেল সেই মহিলার পেটে।

তখন উভয়ে উভয়কে জাপটে ধরে আঘাত করতে শুরু করলো। আঘাত খেয়ে দুজনই ছিটকে পড়লো দু'দিকে। উঠে পড়িমড়ি করে দু'জনই দৌড় দিল দরজার দিকে। ছিটকে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে পড়লো দু'জন।

ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছিল দু'জনেরই শরীর থেকে। পেট চেপে ধরে উঠে বসলো দুই আততায়ী। তারা পরষ্পরের দিকে তাকিয়ে দেখলো, সেখানে কুলসুম নেই, তারা উভয়েই মহলের চাকরানী।

তারা উভয়েই এসেছিল কুলসুমকে হত্যা করতে। দিনে দু'জন মিলেই এ হত্যার পরিকল্পনা করেছিল। কথা ছিল, কুলসুম ঘুমিয়ে গেলে আজ রাতেই তারা তাকে হত্যা করবে। কুলসুমকে হত্যার পরিকল্পনার সময় ওরা কেউ ভাবেনি, এমন ভুল ও জঘন্য ঘটনার শিকার হবে তারা নিজেরাই। নিজেদের ভুলের কারণে এখন দু'জনই মরণাপন্ন। অন্ধকার কামরায় ওরা কেউ কাউকে চিনতে পারেনি। প্রতিপক্ষ কুলসুম ছাড়া আর কেউ হতে পারে এমন ভাবনাও উদয় হয়নি কারো মনে।

সে সময় কুলসুম শুধু মহলেই নয়, ক্রাক শহর থেকেও অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। সেদিনই বাকার তার সাথী গোয়েন্দাদের মারফত খবর পেয়েছিল, হাতিনের সমরাঙ্গনে ক্রুসেড বাহিনী চরমভাবে পরাজয় বরণ করেছে।

ক্রাকের গোয়েন্দারা বাকারকে বললো, 'এবার তুমি কুলসুমকে নিয়ে শহর থেকে পালিয়ে যাও।'

সে রাতে কুলসুমের জন্য শহরের দরজা খোলা কোন ব্যাপারই ছিল না। সবাই জানতো, এ মেয়ে সম্রাট আরনাতের কোন সাধারণ রক্ষিতা নয়, প্রিন্সেস লিলি সম্রাটের সবচে প্রিয়ভাজন নারী। যেখানে তার ইচ্ছার মূল্য দেয় স্বয়ং সম্রাট সেখানে কোন রক্ষীর পক্ষে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা সম্ভব

ছিল না।

রাতে সবাই ঘুমিয়ে গেলে সে তার গাড়ীচালক সায়বলকে ডেকে পাঠালো। বললো, 'সায়বল, বিকালে যখন বেড়াতে বেরিয়েছিলাম তখন আমার গলার হার কোথায় যেন পড়ে গেছে। সম্ভবত বাগানে যে পাথরের ওপর বসেছিলাম ওখানেই পড়েছে। জলদি গাড়ী বের করো। আমি এখনি ওখানে যাবো।'

অনুগত ভৃত্যের মতো সায়বল নামধারী বাকার বিন মুহাম্মদ সাথে সাথে গাড়ী নিয়ে ফটকে হাজির হয়ে গেল। প্রিন্সেস লিলি একই কথা বললো রক্ষীদের। বিলম্ব না করে প্রহরীরা ফটক খুলে দিল। বাকার কুলসুমকে নিয়ে বেরিয়ে এলো মহলের চার দেয়ালের বাইরে।

মহলের কোন মেয়েই কুলসুমকে রাতে যেতে দেখেনি। একমাত্র ফটকের রক্ষী ছাড়া আর কেউ জানতো না কুলসুম বাকারকে নিয়ে মহলের বাইরে গেছে। সেই রাতেই দুই মেয়ে তাকে হত্যা করতে গিয়ে নিজেরা রক্তাক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়।

শহর থেকে সামান্য দূরে তাদের জন্য দুটি ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছিল এক গোয়েন্দা। কয়েকজন অন্ধকারে ওঁৎ পেতেছিল, যদি ওদের কেউ ধাওয়া করে তবে তাদের ব্যবস্থা করার জন্য। গোয়েন্দাটি ঘোড়া নিয়ে অন্ধকারে লুকিয়েছিল। দেখতে পেল এগিয়ে আসছে রাজকীয় গাড়ী। গোয়েন্দাটি সন্তর্পনে ঘোড়া দুটি নিয়ে অন্ধকার থেকে রাস্তায় বেরিয়ে এলো।

গাড়ী সেখানেই রেখে কুলসুম ও বাকার ঘোড়ার পিঠে

আরোহন করে বসলো এবং গোয়েন্দাকে ধন্যবাদ জানিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারের রাজ্যে। পরের দিন রাস্তায় এক কাসেদের কাছ থেকে জানতে পারলো, খৃষ্টান বাহিনী সমূলে ধ্বংস হয়ে গেছে। সম্রাট আরনাত নিহত হয়েছেন। সুলতান আইয়ুবী এখন হাতিনেই আছেন তবে অচিরেই তিনি নাসিবা গমন করবেন।

কুলসুম সুলতান আইয়ুবীর কাছে যেতে চাচ্ছিল। সে বাকারকে বললো, 'তাড়াতাড়ি চলো। আমি সুলতানকে নাসিবা গমন করার আগেই ধরতে চাই।'

তারা তখন গ্যালিলি সাগরের কাছে পৌঁছে গেছে। বাকার কুলসুমকে নিয়ে সাগর পেরিয়ে নির্বিঘ্নে হাতিনে পৌঁছলো। তাকে যখন সুলতান আইয়ুবীর কাছে নিয়ে গেল বাকার, কুলসুম সুলতানের পায়ের উপর আছড়ে পড়লো।

'ওরে আমার বেটি!' সুলতান আইয়ুবী তাকে পায়ের ওপর থেকে টেনে তুলে আদর করে বললেন, 'আমাদের এই সাফল্যের পেছনে তোমার মতো কতো যে মেয়ের অবদান ও ঋণ রয়েছে! আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন তোমাদের কোরবাণী কবুল করেন।'

'আমি তার লাশটি দেখতে চাই।' কুলসুম বললো।

'সকল লাশই জর্ডান নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তাকে আমি নিজ হাতে শাস্তি দিয়েছি। বিশ্বাস করো, তার অপকর্মের শাস্তি সে পেয়েছে।'

'আমি নষ্টা, পাপী। আপনি বলুন, আল্লাহ কি আমাকে ক্ষমা

করবেন?'

'আল্লাহ বড় মেহেরবান। তার দয়া থেকে নিরাশ হতে নেই। নিশ্চয়ই তিনি তোমার খেদমত কবুল করবেন।'

'আমাকে কি আপনি আপনার সাথে থেকে আরো খেদমত করার সুযোগ দেবেন?'

সুলতান কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'অবশ্যই তুমি দ্বীনের আরো খেদমত করার সুযোগ পাবে। তবে আমার সাথে থাকার জন্য আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেননি। আমাকে এখান থেকে আরো বহু দূর যেতে হবে। আমার কথা শোন। তোমাকে আগামীকাল কায়রো পাঠিয়ে দেওয়া হবে। সেখান থেকেই তুমি আমাদের জন্য দোয়া করতে থাকবে। দোয়া করবে আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে দ্বীনের জন্য কবুল করে নেন। যেন আমরা ক্রমশ আরো সামনে অগ্রসর হতে পারি। যেখান থেকে সূর্য উদয় হয় আর সন্ধ্যায় ডুবে যায় তার সবখানে যেন আমরা আল্লাহর দ্বীনের ঝাণ্ডা উড়িয়ে দিতে পারি। সবার কাছে যেন আমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পয়গাম পৌছে দিতে পারি। আপাতত এটুকু করলেই আমাদের জন্য অনেক করা হবে মা।'

হাতিনের সফলতা মুসলমানদের জন্য সবচে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ছিল এ জন্য যে, এই বিজয়ের ফলে মুসলমানদের সামনে ফিলিস্তিনের দরজা উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। হাতিনের সফলতার পথ ধরেই সুলতান আইয়ুবী ফিলিস্তিন প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। এতবড় বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করার পর তার জন্য

বায়তুল মোকাদ্দাস জয় করা খুব সহজ হয়ে গিয়েছিল। তিনি হাতিন ও তার আশপাশের এলাকায় নিজের মজবুত ঘাঁটি গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বায়তুল মোকাদ্দাস জয় করার জন্য যে প্রস্তুতি, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদপত্রের দরকার, এই বিজয়ের ফলে সে সব যোগাড় করা তাঁর জন্য সহজ হয়ে গিয়েছিল।

হাতিন প্রান্তরে সুলতান আইয়ুবী যে সফলতা লাভ করেন তা কোন সাধারণ সফলতা ছিল না। খৃস্টানদের সাতটি সম্রাটের ঐক্যবদ্ধ শক্তি, যারা সুলতান আইয়ুবীকে চিরদিনের জন্য শেষ করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে মাঠে নেমেছিল, হাতিন প্রান্তরে তারা নির্মমভাবে পরাজিত হয়েছিল।

খৃস্টানদের পরিকল্পনা ছিল সুলতান আইয়ুবীকে নিঃশেষ করার পর তারা মদীনা মনোয়ারা ও মক্কা মুয়াজ্জমার দিকে অগ্রসর হবেঁ। মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র মক্কা মদীনা দখল করে তারা দুনিয়ার বুক থেকে ইসলামের নাম-নিশানা মুছে দেবে। তাদের সম্মিলিত সামরিক শক্তি মরুভূমিতে এমন প্রলয় সৃষ্টি করবে, মরুভূমির বালির পাহাড়গুলো ধূলি ঝড় হয়ে সমগ্র মরুভূমিতে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু তাদের সে স্বপ্নই কেবল বানচাল হয়নি, এ যুদ্ধে চারজন প্রতাপশালী খৃস্টান শাসক যুদ্ধবন্দী হয়ে সুলতানের অনুকম্পার ভিখারী হয়েছেন। এদের মধ্যে জেরুজালেমের প্রবল শক্তিধর সম্রাট গে অব লুজিয়ানও আছেন। এই যুদ্ধের ফলে ক্রুসেড বাহিনীর নৈতিক শক্তি একদম ভেঙ্গে পড়েছিল। সুলতান আইয়ুবীর সামরিক শক্তির প্রাধান্য সর্বত্র স্বীকৃতি পেয়েছিল।

যুদ্ধ শেষ হলেও কমান্ডো বাহিনীর তৎপরতা বন্ধ হয়নি। তারা পলাতক খৃস্টান সৈন্যদের ধরে ধরে বন্দী করছিল। খৃস্টান সৈন্যদের মনোবল এমন ভেঙ্গে গিয়েছিল যে, মাত্র একজন মুসলিম সৈন্য ত্রিশ-চল্লিশজন পলাতক খৃষ্টান সৈন্যকে তাবুর রশি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যেতো। খৃস্টান সেনাদের নিরস্ত্র করে তাদের হাঁকিয়ে নেয়ার এমন দৃশ্য ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। ইউরোপের বিভিন্ন ঐতিহাসিকরাও এমন ঘটনার বর্ণনা করেছেন তাদের গ্রন্থে। তারা সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সামরিক যোগ্যতা ও দক্ষতার ভুয়সী প্রশংসাও করেছেন।

ভূমধ্যসাগরের তীরে ইসরাইল রাষ্ট্রের উত্তরে একটি প্রসিদ্ধ শহর আক্রা। এই শহরের খ্যাতির কারণ ছিল, সেখানে ক্রুসেড যুদ্ধের মহান ধর্মীয় নেতা, খৃস্টান বিশ্বের সর্বজন শ্রদ্ধেয় বিশপ নিজে অবস্থান করতেন। তার কাছেই ছিল খৃস্টানদের মর্যাদার প্রতীক বিশাল ক্রুশটি।

এই ক্রুশটি সম্পর্কে খৃস্টানদের ধারণা ও বিশ্বাস ছিল, হযরত ঈসা (আ.)কে এই ক্রুশ কাঠেই বিদ্ধ করা হয়েছিল। ফলে এই ক্রুশকে তারা মহান ও পবিত্র বলে জ্ঞান করতো। সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত প্রতিটি সৈনিককে এই ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করতে হতো– যতোদিন পৃথিবীর বুকে খৃস্টানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত না হবে ততোদিন তারা বিশ্রাম নেবে না। এই আধিপত্য বিস্তারের পথে অন্তরায় ইসলামকে দুনিয়ার বুক থেকে মিটিয়ে দিতে হবে। এ জন্য মুসলমানদের সাথে যখন যুদ্ধ হবে তখন কেউ পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে না।

যুদ্ধবাজ খৃস্টানরা এই ক্রুশ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করতো বলে তাদেরকে বলা হতো ক্রুশধারী আর তারা যে যুদ্ধ করতো তাকে বলা হতো ক্রুসেড। প্রতিজ্ঞাকারী সকল খৃস্টান এই ক্রুশের অনুরূপ ক্ষুদ্র ক্রুশ গলায় তাবিজের মতো ঝুলিয়ে নিত। সুতরাং যুদ্ধের ময়দানে যত খৃষ্টান সৈন্য নিহত হতো ততোবার ক্রুশ পতিত হতো। আল্লামা ইকবাল খৃষ্টানদের এই মৃত্যুকে বলতেন ক্রুশের পতন।

হাতিন ও তার আশপাশে মাইলের পর মাইল এলাকা জুড়ে পড়েছিল খৃস্টানদের লাশ। এমনকি যে সব আহত সৈনিকের পালাবার শক্তি ছিল না তারাও অসহায়ভাবে পড়েছিল ময়দানে। মরণপথের এসব আহত যাত্রীরা যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, কিন্তু তাদের উদ্ধার করার কেউ ছিল না আশপাশে। সামান্য আহত সৈন্যরা মারা গেছে হতাশা ও পিপাসায়। নাইটদের লোহার পোষাকগুলো তপ্ত কড়াই হয়ে উঠার ফলে পোষাকই হয়ে উঠেছিল তাদের মৃত্যুর কারণ। আহতদের দেখার কেউ ছিল না, তাদের পানি পান করানো ও সেবারও কেউ ছিল না। এত বিপুল পরিমাণ আহত সৈন্যের সেবা ও লাশের সৎকার করার মতো সুযোগ ছিল না মুসলমানদেরও। কারণ প্রচণ্ড যুদ্ধে তাদেরও অনেক সাথী আহত ও শহীদ হয়ে গিয়েছিল।

ঐতিহাসিক এন্থনী জুলিয়েট সে যুগের ঐতিহাসিকদের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, হাতিন রণাঙ্গনে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজারেরও অধিক ছিল। এত লাশ উঠানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। তাদের যে সব সাথী বেঁচেছিল তারা হয় যুদ্ধবন্দী ছিল

নয়তো ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। এন্থনী জুলিয়েট আরো লিখেছেন, তাদের লাশ শকুন, কাক ও শিয়ালরা ভক্ষণ করছিল। লাশের তুলনায় শিয়াল ও শকুন ছিল কম। তাই যে সব লাশ শিয়াল ও শকুন খেতে পারেনি কয়েক দিনের মধ্যে সেগুলো শুকনো কংকালে পরিণত হয়েছিল। পাহাড়ের চূড়া, টিলা আর সমতল ময়দান সর্বত্র সেই সব কংকাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল দীর্ঘদিন। প্রথমে কংকালগুলো ছিল কালো, কিন্তু অল্পদিনেই রোদের প্রচণ্ড উত্তাপে সেই অস্থিগুলো শাদা ও ফ্যাকাসে হয়ে যায়।

হাতিনের এই যুদ্ধের ফসল কেটেছিলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। সে অঞ্চলের লাশগুলো পরিষ্কার করার কোন তাগিদ তিনি অনুভব করেননি, সুযোগও পাননি। কারণ সেখানে থাকার মতো অবসর তার ছিল না। তাঁর গন্তব্য ছিল জেরুজালেম। সেখানকার পবিত্র মসজিদ বায়তুল মোকাদ্দাস তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। সেই গন্তব্যে পৌঁছার জন্য তিনি ছিলেন বেকারার।

কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দাস পৌঁছার আগে তিনি আক্রা দখল করতে চাচ্ছিলেন। মুসলমানদের জন্য যেমন মক্কা মুয়াজ্জমা, খৃস্টানদের কাছে তেমনি পবিত্র ভূমি আক্রা। কারণ ওখানেই বাস করতেন খৃস্টানদের পবিত্র ক্রুশের রক্ষক মহান পাদ্রী। খৃস্টানদের বিশ্বাস মতে, তাদের সবচে বড় ক্রুশটিও ওখানেই ছিল।

ক্রুসেড যোদ্ধারা যেই ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করে ময়দানে

আসতো তাদের সেই পবিত্র ক্রুশটি এখন পড়ে আছে সুলতান আইয়ুবীর তাবুর পাশে। আর এই ক্রুশের রক্ষক মহান পাদ্রীর লাশ পড়ে আছে হাতিনের ময়দানে। ফলে আক্রার খৃস্টানরা ভুগছিল চরম আতঙ্কে। এই আতঙ্কের সুযোগ নিতে চাচ্ছিলেন সুলতান আইয়ুবী।

'আমাদের এখন সোজা আক্রার ওপর আক্রমণ চালানো উচিত।' সুলতান আইয়ুবী তার সেনাপতিদের বললেন, 'আল্লাহর অশেষ শোকর যে, তিনি আমাদের বিজয় দান করেছেন।'

তিনি সবার ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে হেসে বললেন, 'তোমরা এ কথা মনে করো না, তোমাদের ক্লান্তি ও অবসাদ সম্পর্কে আমার কোন অনুভূতি নেই। তোমাদের এ ত্যাগের মূল্য আল্লাহ অবশ্যই দান করবেন। আমরা যদি এখন বিশ্রাম নিতে বসি তবে খৃষ্টানরা আবার একত্রিত হয়ে শক্তি সঞ্চয় করার সুযোগ পেয়ে যাবে। আমি তাদের এই ক্ষত শুকাতে দিতে চাই না।'

সেনাপতিরা বিস্মিত হয়ে শুনছিলেন সুলতান আইয়ুবীর কথা। তাদের আশা ছিল, সুলতান এবার বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে অভিযান চালানোর আদেশ দেবেন। কিন্তু তিনি আক্রা দখলের ইচ্ছা প্রকাশ করায় তারা অবাক হলেন।

সুলতানের পিছনেই বিরাট ক্রুশটি দাঁড় করানো ছিল। তিনি ক্রুশটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। সবাই নিরব। তিনি হঠাৎ সেনাপতিদের দিকে ঘুরে বললেন, 'বন্ধুগণ! এটা ঈমান

বা বিশ্বাসের যুদ্ধ! এটা সত্য ও মিথ্যার সংঘর্ষ। এই ক্রুশের সাথে লেগে থাকা রক্তের চিহ্ন দেখো! এ রক্ত হযরত ঈসা (আ.) এর নয়। এ রক্ত সেই পাদ্রীরও নয় যিনি খৃস্টান জগতের মহান ক্রুশের রক্ষক ছিলেন। এ রক্ত সেই সব খৃস্টান নেতাদের, যারা ক্রুশের মর্যাদা রক্ষার কথা বলে অগণিত বনি আদমকে টেনে এনেছে যুদ্ধের ময়দানে। এরা সবাই আল্লাহর সৈনিকদের হাতে মারা গিয়েছে। অতএব এ রক্ত কোন ব্যক্তির নয়, এ রক্ত বাতিলের। এ রক্ত ভিত্তিহীন বিশ্বাস ও আকিদার।'

সুলতান আইয়ুবী আবেগময় কণ্ঠে বললেন, 'তোমরা যখন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করছিলে, যখন তোমাদের ওপর অবিরাম তীর বর্ষণ হচ্ছিল। যখন শত্রুর মেনজানিক তোমাদের উপর আগুন ও পাথর নিক্ষেপ করছিল, সে সময় জাতির মাতা-ভগ্নি-শিশুসহ আবালবৃদ্ধবনিতা হাত তুলে তোমাদের সাফল্যের জন্য আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করেছে। আমি এ জন্যই সকল যুদ্ধ যাত্রা শুক্রবারে করি যাতে জাতির মঙ্গল কামনা তোমাদের সঙ্গে থাকে এবং সেই দোয়ার বরকতে তোমরা বিজয় লাভ করতে পারো।

এ বিজয় প্রমাণ করে, তোমাদের ওপর আল্লাহ খুশী আছেন। এটা আমাদের মহান বিশ্বাস ও ঈমানের বিজয়। আমি তোমাদের কেন এ কথা বলছি? বলছি এ জন্য যে, এভাবেই আমরা আমাদের ঈমানকে আরো দৃঢ় ও মজবুত করে নিতে চাই, যাতে আমরা আল্লাহর রশি আরো শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারি।

তোমরা হয়তো বিস্মিত হচ্ছো, আমি আক্রার উপর আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি বলে। এর পেছনে কোন আবেগ নেই এমন নয়। খৃস্টানরা একবার মক্কা ও মদীনার দিকে অভিযান চালিয়েছিল। সম্রাট শাহ্ আরনাত ও কাউন্ট রিজনাল্ট মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে মাত্র চার মাইল দূরে ছিল। আমি সম্রাট আরনাতের মক্কা আক্রমণের দূরভিসন্ধির প্রতিশোধ নিয়েছি। এখন খৃস্টান শাসকদের দুঃস্বপ্ন মিটিয়ে দেয়া বাকি। আক্রা তাদের মক্কা। আক্রা দখল করে আমি তাদের মনোবল গুড়িয়ে দিতে চাই। আজও তারা মসজিদুল আকসা অপবিত্র করছে। তাই আমাদের দৃষ্টি আটকে আছে বায়তুল মোকাদ্দাসে। কিন্তু ওখানে পৌঁছতে হলে আগে আক্রা দখল করা প্রয়োজন। এতে খৃষ্টানদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে এবং বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধার করা আমাদের জন্য সহজ হয়ে যাবে।'

সুলতান আইয়ুবীর হাতে যুদ্ধের নকশা ছিল। তিনি সেটি খুলে সবার সামনে মেলে ধরলেন। হাতিনের ওপর আঙ্গুল রেখে বললেন, 'আমরা এখন এইখানে।' তিনি আঙ্গুল আক্রার দিকে এমনভাবে নিয়ে গেলেন, যেন তিনি কিছু কাটছেন। তারপর বলতে লাগলেন, 'আমি খৃস্টানদের রাজ্যকে দুটি অংশে বিভক্ত করে তার মাঝখানে গিয়ে বসবো। আক্রা অধিকার করে টায়ের, বৈরুত, হায়ফা, আসকালান ও সাগর কূলের ছোট বড় সমস্ত শহর ও গ্রামগুলোকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে নেবো। একটি খৃষ্টানকেও, সে সৈন্য হোক বা বেসামরিক লোক, এ অঞ্চলে থাকতে পারবে না। কারণ উপকূলবর্তী এলাকাগুলো যুদ্ধের

জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপের কিছু সম্রাট এখানকার খৃষ্টানদের সাহায্যের জন্য ছুটে আসতে পারে। তারা এলে আসবে এই সমুদ্র পথেই। তাই উপকূল অঞ্চল থাকতে হবে তোমাদের দখলে, যাতে শত্রুদের কোন সমুদ্র তরী কূলে ভিড়তে না পারে। এখান থেকেই আমরা বায়তুল মোকাদ্দাসের যুদ্ধ পরিচালনা করবো।'

ফিলিস্তিন (বর্তমান ইসরাইলসহ) ও লেবাননের মানচিত্র দৃষ্টির সামনে তুলে ধরলে এখনো দেখা যায় গ্যালিলি সাগরের পাড়ে হাত্তিন অঞ্চল। তার বিপরীত দিকে সাগরের উপকূলে আক্রা শহর অবস্থিত। দক্ষিণে জেরুজালেম ও বায়তুল মোকাদ্দাস। হাত্তিন থেকে আক্রা মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে আর জেরুজালেম সত্তর মাইল তফাতে অবিস্থত। বর্তমানে ফিলিস্তিন ও লেবাননে খৃস্টান আধিপত্য চলছে। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর পরিকল্পনা ছিল, হাত্তিন থেকে আক্রা পর্যন্ত তিনি এমন অভিযান চালাবেন যাতে রাস্তার পাশে যে সব এলাকা পড়বে সেখানে মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে শুধু মুসলমানদেরই আবাসভূমি থাকবে। অন্য কোন ধর্মের লোক এই সাগর উপকূলে থাকবে না। যুদ্ধ বিশেষজ্ঞগণ তার পরিকল্পনাকে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ বলে অভিহিত করেছেন। মুসলমানরা এই পরিকল্পনার ওপর টিকে থাকতে পারলে বর্তমান ফিলিস্তিনের চেহারা হতো ভিন্ন রকম।

সুলতান আইয়ুবী খৃস্টান শক্তিকে দুই ভাগে ভাগ করতে চেয়েছিলেন। কারণ তাঁর সৈন্য বাহিনী খৃস্টানদের তুলনায় ছিল

কম। যদিও এই অল্প সংখ্যক সৈন্য নিয়েই তিনি বিশাল খৃস্টান বাহিনীর প্রভূত ক্ষতি সাধন করেছেন, তবু তিনি চাচ্ছিলেন খৃস্টশক্তিকে বিভক্ত করে ফেলতে, যাতে তারা কখনো তীব্র চাপ সৃষ্টি করতে না পারে।

'আক্রার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা যথেষ্ট শক্তিশালী।' সুলতান আইয়ুবী তার সেনাপতিদের বললেন, 'আমাদের গোয়েন্দারা জানিয়েছে, সেখানে যুবক ও কর্মঠ মুসলমানদের তারা বন্দী করে বেগার খাটাচ্ছে। শিশু ও মেয়েসহ সব মুসলমানই সেখানে মূলতঃ গৃহবন্দী। তাই লড়াই শুরু হলে ভেতর থেকে আক্রার মুসলমানরা তেমন কোন সাহায্য করতে পারবে না। অপরদিকে খৃস্টানরা শহরের প্রতিরক্ষায় জীবন পণ করে লড়বে। কারণ আধিপত্য হারানোর পরিণাম কি তা তারা ভাল করেই জানে।'

সুলতান বললেন, 'আমি আক্রায় দীর্ঘ কোন অবরোধ করতে চাই না। আমাদের আক্রমণ হবে ঝড়ের মত উদ্দাম। আক্রা পর্যন্ত আমাদের অভিযানে সহযোগিতা করবে কমান্ডো বাহিনী।

রাস্তায় যে সব বস্তি পড়বে সে সব তছনছ করে এগুবো আমরা। কিন্তু সেনাবাহিনীর কোন সদস্য গনিমতের মালের আশায় পথে কোথাও থামতে পারবে না। এ কাজের জন্য আমি আলাদা বাহিনী নিয়োগ করছি।'

আক্রায় মুসলমানদের অবস্থা এমন ছিল, কোন বৃদ্ধ বা অচল ব্যক্তিও স্বাধীন ও মুক্ত ছিল না। সবাই আতঙ্কের জীবন

কাটাচ্ছিল। বেগার কয়েদীদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। অন্যভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, পুরো আক্রা শহরই মুসলমানদের জন্য ছিল একটি বৃহৎ কারাগার। কোন মুসলমানের স্ত্রী-কন্যার মান সম্মান নিরাপদ ছিল না। খৃস্টানদের উদ্দেশ্য ছিল, মুসলমানরা আক্রায় থাকবে, তবে তারা থাকবে শুধু খৃস্টানদের সেবা করার জন্য।

তারা সেখানে মুসলিম শিশুরা যেন ইসলামী জীবনবোধে উজ্জীবিত হতে না পারে সে জন্য সেখানকার সব ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছিল। সেখানকার মসজিদগুলো বিরান হয়ে পড়েছিল মুসল্লির অভাবে।

১১৮৭ সালের ৪ জুলাইয়ের পর সেখানে খৃস্টানরা মুসলমানদের ওপর অত্যাচার ও উৎপীড়নে নতুন মাত্রা যোগ করে। তারা নতুন করে ভীষণ নির্যাতন চালাতে শুরু করে। বাড়ীতে যে সব মুসলমানরা ছিল তাদেরকে তাড়া করে বাড়ী থেকে উচ্ছেদ করে দেয়। শহরে ভাসমান মুসলমানদের জোর করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। কারাগার মানে তাদের সেই চিরাচরিত বেগার ক্যাম্প, যেখানে বিনা পয়সায় মুসলমানদের শ্রম আদায় করা হয়।

সেখানে মুসলমানদের কাছ থেকে জবরদস্তি পশুর মত বেগার শ্রম আদায় করতে লাগলো খৃস্টানরা। ৫ জুলাইয়ের পর তাদেরকে কাজের জন্য বাইরে না এনে তাদের উপর কঠোর নির্যাতন শুরু করে। বিনা কারণে প্রহারে প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে এই সব হতভাগা বন্দীরা। মুসলমানরা বুঝতে

পারে, খৃষ্টানরা কোথাও চরম পরাজয়ের শিকার হয়েছে, অথবা মুসলমানরা কোন খৃস্টান শহর অবরোধ করে রেখেছে।

মেয়েরা এই জুলুমের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর দরবারে আকুল হয়ে প্রার্থনা করতে লাগলো। তারা সিজদায় পড়ে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করছিল। কারাগারের নিষ্পাপ শিশুদের চেহারায় লেপ্টে ছিল নীরব কান্না। কচি শিশুরা ঘুম থেকে জেগে উঠলে মায়েরা তাদেরকে দোয়ার জন্য হাত উঠাতে বলতো। বলতো, 'বলো বাছারা, আল্লাহ যেন আমাদের হেফাজত করেন। তিনি যেন ইসলামের বিজয় দান করেন। মুক্ত মুসলমানদের যেন শক্তি ও সাহস দান করেন। তারা যেন আমাদেরকে জালিমের জুলুম থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে পারে।'

শত শত শিশু ও মায়েরা এভাবে আকুল হয়ে কাঁদছিল আল্লাহর দরবারে। শিশুরা কিছু না বুঝেই মায়ের চোখে অশ্রু দেখে কাঁদতো। তাদের কান্না ও আহাজারির ধ্বনিতে কাঁপছিল আল্লাহর আরশ। তাদের মনে হতো, কোটি কোটি জ্বিন ও ফেরেশতারাও যেন শামিল হয়েছে সে আহাজারিতে।

ভীত সন্ত্রস্ত মুসলমানরা চোখ মেললেই দেখতে পেতো, নতুন নতুন বন্দীদের ধরে আনা হচ্ছে বেগার ক্যাম্পে। শহরে যাদের বাড়ী ছিল, ভিটামাটি ছিল, সম্পন্ন ব্যবসা ছিল, সবখান থেকেই তাদের উচ্ছেদ করা হচ্ছে। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ও মর্যাদাবান এসব নাগরিকের স্ত্রী ও শিশুদেরও ধরে এনে তাদের ওপর চাবুক মেরে মেরে ক্ষত বিক্ষত করা হচ্ছে তাদের।

১১৮৭ সালের ৬ জুলাই। মধ্যরাত অতীত হয়ে গেছে। সহসা শহরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেল। শহরের এখানে ওখানে জ্বলে উঠলো আগুনের লকলকে শিখা। ঘুমন্ত মানুষের ঘুম ছুটে গেল মানুষের কোলাহলে। খৃস্টানদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো অজানা ভীতি ও আতঙ্ক। শহরের চার দেয়ালের বাইরে থেকে একের পর এক ছুটে আসছে অগ্নিতীর। সেই তীরের কয়েকটি এসে পড়লো বেগার,ক্যাম্পের কাছে।

মোটা রশির জাল দিয়ে ঘেরাও করা ছিল ক্যাম্পের বেড়া। খুব কড়া পাহারার প্রয়োজন ছিল না। কারণ ওই কয়েদখানা থেকে পালাবার কথা চিন্তাও করতো না কেউ। রাতে ক্যাম্পের আশপাশে মশাল জ্বালিয়ে রাখা হতো যাতে বন্দীদের দেখতে পাওয়া যায়।

শহর জুড়ে চলছিল হুলুস্থুল। এই ডামাডোলের মধ্যে এক কয়েদী বাইরে থেকে আসা একটি তীর ছুটে গিয়ে উঠিয়ে আনলো। মশালের আলোয় এনে তীরটি দেখেই সে চিৎকার দিয়ে বললো, 'এ তীর আমি খুব ভালমত চিনি, এ তীর মুসলিম বাহিনীর।'

রশির জালের বেড়া ভেদ করে একটি তীর শাঁ করে এসে ওই কয়েদীর বুকে বিদ্ধ হলো। বন্দীর চিৎকার শুনে এক খৃস্টান রক্ষী সঙ্গে সঙ্গে তীর মেরে স্তব্ধ করে দিল এক মুসলমান কয়েদীর উল্লাস।

ততোক্ষণে সমস্ত শহর জেগে উঠেছে। শহর ও কেল্লার প্রাচীরের ওপর ছুটাছুটি করছে খৃস্টান রক্ষী সেনারা। বাইরে

থেকে তীরের বর্ষণ আরো তীব্রতর হলো। শহরের বাইরে থেকে ভেসে এলো আল্লাহু আকবার ধ্বনি।

সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা এবার মেনজানিক দিয়ে বড় বড় পাথর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। যে সব খৃস্টান সৈন্য প্রাচীরের ওপর উঠে গিয়েছিল সে সব পাথর এসে আঘাত করছিল তাদের ওপর।

সুলতান আইয়ুবীর এটা ছিল অতর্কিত ঝটিকা আক্রমণ। তিনি নিজেই এ আক্রমণের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। প্রথম ধাক্কার রেশ কেটে গেলে কেল্লার পাঁচিলের ওপর অবস্থান নিল খৃস্টান সৈন্যরা। পাঁচিলের ওপর দেয়ালের আড়াল নিয়ে তারাও তীর বর্ষণ শুরু করলো। পাঁচিলের ওপর বিভিন্ন জায়গায় সেন্ট্রিবক্স ও মেনজানিক কামান বসানো ছিল। রক্ষীরা সেগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নিয়ে সেখান থেকে শুরু করলো কামান দাগা। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।

শহরে অগ্নি নিক্ষেপের চেয়ে মেনজানিক দিয়ে দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করছিল মুসলমানরা। তারা শহরের প্রধান ফটক ও প্রাচীরের ওপর ভারী পাথর নিক্ষেপ করছিল।

সুলতান আইয়ুবীর জানবাজরা চাকাওয়ালা উঁচু উঁচু মাচান তৈরী করে নিয়েছিল। প্রত্যেক মাচানের উপর দশ-বিশজন সৈন্য দাঁড়াতে পারতো। মাচানগুলো টানার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছিল উট ও ঘোড়া। এই চলন্ত মাচান নিয়ে দেয়ালের দিকে অগ্রসর হলো মুসলমানরা। খৃস্টানরা তাদের প্রাণপণে বাঁধা দিল। কিন্তু কয়েকটি গাড়ী তীব্র বাঁধা উপেক্ষা করে শহর রক্ষা

প্রাচীরের কাছে পৌঁছে গেল।

প্রাথমিক ধাক্কা কাটতেই শহরের খৃস্টান নাগরিকরা সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য ছুটে গেল। তারা পাঁচিলের ওপর গোলাবারুদ ও তীর ধনুক তুলে দিচ্ছিল। যুদ্ধের নেতৃত্ব দিচ্ছিল বিভিন্ন নাইটরা। যে সব যুবক তীর চালাতে জানতো তারাও পাঁচিলের ওপর উঠে সৈন্যদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে লাগলো। তারা চলন্ত মাচানের উপর তীর বর্ষণ করছিল। কিন্তু ওরা অবাক হয়ে দেখতে পেলো, মাচানের ওপরের সৈন্যরা মাচান থেকে নেমে কাঠের মাচান মাথার ওপর তুলে নিয়ে প্রাচীরের দিকে ছুটে আসছে। ওদের পাঠানো তীরগুলো গেঁথে যাচ্ছে সেই কাঠের পাটাতনে।

খৃস্টান সৈন্যরা তীর মারা বাদ দিয়ে এবার ওদের ওপর পেট্রোলের হাড়ি ও অগ্নি বর্ষণ শুরু করলো। এবার বিপাকে পড়ে গেল মুসলমানরা। তাদের মাথার ওপর যে কাঠের পাটাতন ছিল তাতে পেট্রোল ও আগুন নিক্ষিপ্ত হওয়ায় মুহূর্তে মাথার ওপর জ্বলে উঠলো দাউ দাউ আগুন।

ভেতরে বন্দীদের মধ্যে এক অভূতপূর্ব দৃশ্যের সূচনা হলো। হাজার হাজার বন্দী 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শব্দে জোরে জিকির আরম্ভ করলো। মেয়েরাও পুরুষের সাথে অশ্রুভেজা কণ্ঠে জিকির করছিল। এক সময় একজন উচ্চস্বরে বললো, 'নাছরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন কারিব।' শিঘ্রই সমস্ত পুরুষ নারী ও শিশুর কণ্ঠে উঠে এলো এ শব্দ। বাতাসে গুঞ্জরিত হতে থাকলো সেই সুরেলা শব্দ, 'নাছরুম মিনাল্লাহি ওয়া ফাতহুন

কারিব।' মনে হলো, সমস্ত শহরে এ শব্দ ধ্বনি প্রতিধ্বনি হচ্ছে।

কয়েকজন খৃস্টান সৈন্য ভেতরে এসে বন্দীদের শব্দ করতে নিষেধ করলো। কিন্তু তাদের কথা গ্রাহ্য করলো না বন্দীরা। কতিপয় অতি উৎসাহী বন্দী সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

খৃস্টান সৈন্যরা গেট খোলা রেখেই বন্দীদের থামাতে এসেছিল। এই সুযোগে সমস্ত বন্দী কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য ছুটলো গেটের দিকে। অবস্থা বেগতিক দেখে বাইরের রক্ষীরা বন্দীদের ওপর তীর ছুঁড়তে শুরু করলো। তীরের আঘাতে সামনের কিছু বন্দী লুটিয়ে পড়লো গেটের কাছে। বন্দীরা দিশেহারা হয়ে উল্টো দিকে ছুটতে শুরু করলো।

বন্দীদের মধ্যে এই বিশৃংখলা দেখে ছুটে এলো খৃস্টান অশ্বারোহীরা। তারা হাতে বর্শা নিয়ে খোলা গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকেই ঝাঁপিয়ে পড়লো কয়েদীদের ওপর। কিছু কয়েদী অশ্বারোহীদের বর্শার আঘাতে মারা পড়তেই থেমে গেল বন্দীদের কোলাহল। আতঙ্কিত কয়েদীরা ভয়-বিস্ফারিত নয়নে ফিরে গেল নিজ নিজ বিছনার কাছে।

পলায়নপর কয়েদীরা সফল হতে পারলো না। নারী ও শিশুরা মনে মনে আল্লাহকে ডাকতে লাগলো। শহরের একপাশে তখন মুসলমানরা বড় মেনজানিক দিয়ে প্রাচীরের উপর ভারী পাথর বর্ষণ করছে।

সারা রাত ধরে সুলতান আইয়ুবীর জানবাজ সৈন্যরা জীবন

বাজি রেখে প্রাচীরের কাছে পৌছতে চেষ্টা করলো। উদ্দেশ্য, দেয়াল ভেঙ্গে শহরে প্রবেশ করবে। কিন্তু ওপর থেকে অব্যাহত গতিতে খৃষ্টানদের অগ্নিবর্ষণ ও পাথর নিক্ষেপ চলতে থাকায় তা আর সম্ভব হলো না। সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা বেহিসেব জীবন দিয়েও সেই রাতে শহরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হলো।

যখন সকাল হলো, দেখা গেল দেয়ালের ওপর নগরবাসী ও খৃস্টান সৈন্যরা নিশ্ছিদ্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তারা প্রাণপণে তীর ও পাথর নিক্ষেপ করে যাচ্ছে।

সারাদিন অব্যাহত যুদ্ধ চললো। কিন্তু তাতে কোন সুরাহা হলো না যুদ্ধের। রাতদিন একাকার করে যুদ্ধ চলতেই লাগলো। রাতে এক অভিনব ও অভাবিত বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন সুলতান। অতীতে এ ধরনের কোন পরিস্থিতির শিকার তাকে হতে হয়নি। ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি কেবল বিস্মিতই হননি রীতিমত বিপর্যস্ত হয়ে গেলেন। খৃস্টানরা এমন মারমুখী ও কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন এমন কোন ধারনাও করেননি সুলতান।

ঘটনাটি এ রকম। অতীতে আইয়ুবীর কমান্ডো বাহিনীর অভিজ্ঞতা থেকে খৃস্টানরাও নিজেদের মধ্যে কমান্ডো গ্রুপ তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলো। কয়েকজন নাইটের তত্ত্বাবধানে তৈরী হলো কয়েকটি কমান্ডো গ্রুপ। সামরিক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের দেয়া হলো মানসিক প্রশিক্ষণ। খৃস্টান পাদ্রী তাদের বুঝালো, 'ধর্মের জন্য জীবন দিলে স্বর্গ

নিশ্চিত। প্রয়োজনে তাদের আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মুসলমান কমান্ডোদের মতো জীবন উৎসর্গ করার শপথ নিয়ে ঢুকে পড়তে হবে শত্রুর বুহ্যে।' তাদের আরো বলা হলো, 'যারা এই বাহিনীতে শরীক হবে সাধারণ সৈন্যদের চেয়ে তাদের বেতন হবে দশগুণ। যদি কেউ মারা যায় তিন পুরুষ পর্যন্ত তার পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করবে গীর্জা। অর্থাৎ ইহকাল ও পরকাল দুই কালই তোমাদের সফলতায় ভরে উঠবে।'

ওই রাতে তারা পেছন দরজা দিয়ে বেরিয়ে আইয়ুবীর বাহিনীর পেছন থেকে আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিল। তখন এক নাইট বললো, 'আমরা পেছন থেকে আক্রমণ করেও তাদের ততো ক্ষতি করতে পারবো না যতোটা সম্ভব কৌশলের আশ্রয় নিলে। আমরা ক্রাকের নির্যাতীত মুসলমানের ছদ্মবেশে ওখানে যাবো এবং ওদের সাথে মিশে ওদের অস্ত্র ও গোলাবারুদ হস্তগত করে নেবো। তারপর সুযোগ বুঝে সেই অস্ত্র ঘুরিয়ে ধরবো ওদের দিকে।'

প্রস্তাবটা মনপূত হলো সবার। ওরা সাধারণ মুসলমানের পোষাক পরে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে ছুটে গেল আইয়ুবীর বাহিনীর দিকে। আইয়ুবীর কাছে পৌঁছে বললো, 'আমরা ক্রাকের নির্যাতীত মুসলিম। যুদ্ধের ডামাডোলে পেছন দরজা দিয়ে আমরা পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছি। আমাদের আরো সঙ্গী শহরে রয়ে গেছে। খৃস্টানরা টের পেয়ে ফটক বন্ধ করে দেয়ায় ওরা

আসতে পারেনি। আপনি আমাদের জিহাদে শরীক করে নিন।'

সুলতান তাদেরকে অস্ত্র এগিয়ে দেয়ার কাজে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে নিয়োগ করলেন। ওরা কিছুক্ষণ খুব আন্তরিকতা ও দরদের সাথেই মুজাহিদদের হাতে তুলে দিল তীর ধনুক। তারপর যখন নিজেরা সবাই তীর ধনুক হাতে নেয়ার সুযোগ পেলো তখন রাতের অন্ধকারে খুব কাছে থেকে মুসলমান সৈনিকদের ওপর তীর চালাতে শুরু করলো। কয়েক মিনিটের মধ্যে বহু মুজাহিদ ঢলে পড়লো মৃত্যুর কোলে। যখন সুলতান এবং মুসলিম সেনাপতিরা বিষয়টি বুঝতে পারলেন ততোক্ষণে ক্ষতি যা হবার হয়ে গেছে।

সুলতান ত্বরিত দলটিকে ঘিরে ফেলার আদেশ দিলেন। মুজাহিদরা মুহূর্তে দলটিকে ঘিরে ফেললো। এরপর তুমুল যুদ্ধ হলো ওদের সাথে। ওরা কেউ আত্মসমর্পন না করে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করে গেল্লো। পরে এই আত্মঘাতি দলের এক আহত কমান্ডোর কাছ থেকে উদ্ধার হলো আসল ঘটনা।

সেই রাতেই দেয়ালের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল যে সামান্য সংখ্যক মুসলিম সেনা, তারা বসেছিল না। প্রাচীরের সাথে মিশে গিয়ে তারা দেয়াল ভাঙ্গার কাজ শুরু করে দিয়েছিল। সকালে দেখা গেল, একস্থানে তারা দেয়ালের ভেতর বেশ বড়সড় গর্ত করে ফেলেছে।

সকালে সুলতান আইয়ুবী ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন যুদ্ধের সর্বশেষ অবস্থা। মুজাহিদবেশী খৃস্টান আত্মঘাতি দলের সদস্যদের লাশগুলো দেখিয়ে এক

সেনাপতিকে বললেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নতুন মাত্রা যোগ হলো। এখন থেকে এ ধরনের আত্মঘাতি বাহিনীর মোকাবেলা করার বিষয়টিও আমাদের নজরে রাখতে হবে।'

তিনি ঘোড়া নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একস্থানে গিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। দেখলেন, জানবাজ মুজাহিদরা দেয়ালের বেশ খানিকটা ভেতরে ঢুকে পড়েছে। তিনি তার সৈন্যদের আদেশ দিলেন, যেখানে দেয়াল ভাঙ্গা হচ্ছে ওর আশপাশে তীর বর্ষণ তীব্রতর করতে। বললেন, 'দরকার হলে অন্যদিক থেকে তীরন্দাজদের এখানে নিয়ে এসো। দেয়াল ভাঙ্গা সৈন্যদের ওখানে আরো সৈন্য পাঠাও। তারা আগের সৈন্যদের সাথে মিলে দেয়াল ভাঙ্গার কাজ দ্রুততর করবে।'

জানবাজ আরো কিছু মুসলিম সৈন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সেখানে পৌঁছে গেল। মুসলমান তীরন্দাজরা প্রাচীরের ওপর এমন তীব্রভাবে তীর বর্ষণ করছিল যে, দেয়ালের ওপর অবস্থিত খৃষ্টান সৈন্যদের নিচের দিকে তাকাবার কোন সুযোগ পাচ্ছিল না।

আইয়ুবীর দুর্ধর্ষ সৈন্যরা দ্রুত হাতে কাজ করছিল। নতুন সৈন্যের আগমনে ওদের সাহস এবং উদ্যম আরো বেড়ে গেল। তারা অল্প সময়ের মধ্যেই সুড়ং আরো অনেক বড় করে ফেললো। দুপুরের আগেই দেয়ালের মাঝে এক সাথে দু'জন লোক যাতায়াত করার মত সুড়ং তৈরী হয়ে গেল।

সুলতান আইয়ুবী সেই সুড়ং পথে সৈন্যদের ভেতরে প্রবেশ করার হুকুম দিলেন। জেহাদী জযবায় ভরপুর মুজাহিদরা

কালবিলম্ব না করে ছুটলো সুড়ংয়ের দিকে। তাদের মাঝে বিরাজ করছিল যুদ্ধের উন্মাদনা। নির্দেশ পাওয়া মাত্র তারা দেয়ালের ফুটোর দিকে দৌড় দিল এবং লাইন ধরে ভেতরে চলে গেল।

খৃস্টান বাহিনী দেয়ালের ওপর থেকে নিচে এলো তাদের বাঁধা দিতে। তারা নেমে আসতে যে সময় লাগলো ততোক্ষণে অনেক মুসলিম সৈন্য শহরের মধ্যে ঢুকে গেলো। শহর রক্ষী খৃস্টান সৈন্য ও নাগরিকরা জীবনপণ লড়াই করতে লাগলো।

লড়াই চলছিল শহরের রাস্তায় রাস্তায়। তলোয়ারের ঠোকাঠুকি ও আহতদের আর্ত চিৎকারে শহরে এক বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। কয়েকজন মুজাহিদ দৌড়ে গিয়ে শহরের প্রধান ফটক খুলে দিল। এবার দলে দলে মূল ফটক দিয়ে শহরে প্রবেশ করতে শুরু করলো আইয়ুবীর সৈন্যরা। পদাতিক বাহিনীকে সরিয়ে দিয়ে প্রথমেই ঢুকলো অশ্বারোহী বাহিনী। তাদের পেছন পেছন ঢুকলো পদাতিক ফৌজ। সারা শহর রণক্ষেত্রে পরিণত হলো।

মুসলমানরা শহরে প্রবেশ করতেই সারা শহরে হুলুস্থুল ও ছুটাছুটি আরম্ভ হয়ে গেল। সেখানকার খৃস্টানরা আগেই সংবাদ পেয়েছিল, তাদের মহান ও বিশাল ক্রুশটি মুসলমানদের দখলে চলে গেছে। এই ক্রুশের মহান রক্ষকও নিহত হয়েছেন হাতিনের যুদ্ধে।

হাতিন থেকে পালিয়ে আসা খৃস্টান সৈন্যরাই আক্রাতে এ খবর রটিয়েছিল। এইসব পালিয়ে আসা সৈন্যদের অনেকেই

ছিল আহত। তারা তাদের পরাজয়ের বিভীষিকাময় সংবাদ ছড়িয়ে আগেই শহরে একটা আতঙ্কের পরিবেশ তৈরী করে দিয়েছিল। যখন সুলতান আইয়ুবীর দুর্ধর্ষ সৈন্যরা দেয়াল ভেঙ্গে বন্যার মত ভেতরে প্রবেশ করলো তখন আক্রার খৃষ্টান নাগরিকরা ভয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে গেল। খৃস্টান বাহিনী প্রাণপণ যুদ্ধ করেও মানুষের সেই আতঙ্ক দূর করতে পারেনি।

মুসলমানরা শহরে ঢুকতেই সেখানকার সাধারণ খৃস্টানরা শহর ছেড়ে পালানোর জন্য গেটের দিকে ছুটে গিয়েছিল কিন্তু ওই পথে মুসলমানদের ঢুকতে দেখে এবার তারা ছুটলো পেছন দরজার দিকে। তারা শহরের সব কয়টি ফটকই খুলে দিল। খৃস্টান সৈন্যরা তাদের বাঁধা দেয়ার কোন সুযোগই পেলো না। শহরের সব লোক ছুটলো সেই খোলা ফটকের দিকে।

শহরের সব কটা দরজা খোলা পেয়ে মুসলমান অশ্বারোহীরা তাদের কমান্ডারের আদেশে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। তারা অশ্বপদতলে লোকদের মাড়িয়ে শহরে প্রবেশ করতে শুরু করলে খৃস্টানরা দিশেহারা হয়ে শহরময় ছুটাছুটি করতে লাগলো।

এই হট্টগোলের মধ্যে মুজাহিদদের বাঁধা দেয়ার শক্তি হারিয়ে ফেললো খৃস্টানরা। সমস্ত দরজা দিয়ে মুসলমানরা দলে দলে প্রবেশ করছে দেখতে পেয়েই খৃষ্টান সৈন্যরা অস্ত্র ফেলে পালাতে শুরু করে।

অসহায় নারী ও শিশুদের ক্রন্দনরত প্রার্থনা আল্লাহর দরবারে পৌছে গিয়েছিল। কাফেরদের নির্মম অত্যাচার উৎপীড়ন

সইতে না পেরে যেসব শিশু ও মেয়েরা কাঁদছিল তাদের আহজারীতে কেঁপে উঠেছিল আল্লাহর আরশ। আল্লাহ সুলতান আইয়ুবীর মাধ্যমে তাদের মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাই খৃস্টানদের সকল বাঁধাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরের নিয়ন্ত্রণভার মুসলমানদের হাতে চলে গেল। পরাজিত খৃস্টান সৈন্যরা হাতিয়ার ফেলে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হলো।

সূর্য ডোবার খানিক আগে আক্রার বন্দী সৈন্যদের সুলতান আইয়ুবীর সামনে হাজির করা হলো। সুলতান আইয়ুবী খৃস্টান বাহিনীর সেনাপতি, কমান্ডার ও সৈন্যদের পৃথক স্থানে রাখার হুকুম দিয়ে ছুটে গেলেন বেগার ক্যাম্পের দিকে। সেখানকার অবর্ণনীয় অবস্থা দেখে সুলতানের চোখ দুটো অশ্রুসজল হয়ে উঠলো।

বেগার ক্যাম্পের প্রহরী ও রক্ষীরা পালিয়ে গিয়েছিল। কয়েদীরা কয়েদখানার বেড়া কাটতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। কয়েকজন চেষ্টা করছিল গেট ভাঙ্গার।

সুলতান আইয়ুবী দূর থেকেই তাদের দেখতে পেলেন। সেখানকার হাড্ডিসার মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে হলো ওরা মানুষ নয়, জীবন্ত কঙ্কাল। তিনি যখন অসহায় নারী ও শিশুদের দেখলেন তখন তাঁর চোখের অশ্রু আর বাঁধা মানলো না, তাঁর ঝাপসা দৃষ্টি থেকে টপটপ করে গড়িয়ে নিচে পড়তে লাগলো।

'যাও, গেট খুলে দাও। না পারলে বেড়া কেটে ওদের মুক্ত করো।' সুলতান আইয়ুবী অশ্রুভেজা কণ্ঠে বললেন, 'আর তাদের বলবে, সময় মতো আমি তাদের সাহায্যে আসতে পারিনি বলে তাদের কাছে আমি খুবই লজ্জিত।'

সুলতান আইয়ুবীর একদল অশ্বারোহী ছুটে গেল সেখানে। তারা কাঠের গেট ভেঙ্গে ফেললো। কয়েদখানার বেড়াও ভেঙ্গে দিল। বন্দীরা দৌড়ে বেরুতে গিয়ে কয়েকজনকে পায়ের নিচে পিষে মারলো। অশ্বারোহীরা তাদের শান্ত করার জন্য উচ্চস্বরে বলতে লাগলো, 'তোমরা শান্তির সাথে বের হও। হুড়োহুড়ি করো না। তোমরা এখন আর বন্দী নও। কেউ আর তোমাদের ধরতে আসবে না। কেউ তোমাদের ওপর অত্যাচার নির্যাতন করতে পারবে না। ওই দেখো, এই শহর ও কেল্লার ওপরে শান্তির পতাকা উড়ছে।'

'ওরা আমাদের পাপের শাস্তি ভোগ করছে।' সুলতান আইয়ুবী একটু দূরে দাঁড়িয়ে এক সেনাপতিকে বললেন, 'এটা গাদ্দারদের পাপের শাস্তি। গাদ্দারদের পাপের প্রায়শ্চিত্য করতে হচ্ছে এই সব নিষ্পাপ ও অসহায়দের। কারণ গাদ্দাররা যখন দ্বীন ও ঈমানের সাথে বেঈমানী করছিল তখন সমগ্র জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওদের টুটি চেপে ধরেনি। নিজের গায়ে আচড় লাগেনি বলে চুপ করে থেকে সুযোগ দিয়েছে গাদ্দারদের। গাদ্দাররা জাতির শত্রুকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু তারা চিন্তা করেনি, তাদের এ কাজের পরিণতি কত ভয়াবহ হতে পারে। জাতির জন্য তাদের এ ভূমিকা কি ভয়ংকর বিপদ ডেকে

আনতে পারে। যখন সেই বিপদ তাদের মাথায় চাপলো তখন আর ওদের করার কিছু ছিল না। ফলে এই অমানুষিক লাঞ্ছনা, অপমান ও দুর্গতি ভোগ করা ছাড়া ওদের কোন উপায় ছিল না।'

'কিন্তু সুলতান, ওরা তো মানবতার কথা বলে? প্রেমের বাণী শোনায়? এই কি ওদের প্রেমের নমুনা?'

হযরত ঈসা (আ.) প্রেম ও ভালবাসার বাণীই প্রচার করেছিলেন। শুধু হযরত ঈসা (আ.)ই নন, সকল নবী রাসূলই মানুষকে মানবতা ও মহত্ত্বের শিক্ষা দিয়েছেন। তারা মানুষকে সভ্যতার বিকাশ ও নিরাপত্তা রক্ষার উপায় শিখিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রুশের পুজারী ধর্মরক্ষকদের মধ্যে মুসলিম বিদ্বেষ এতটাই প্রবল যে, তারা তাদের নবীর কথাও ভুলে গেছে।

তারা বলে, 'দুনিয়াতে মাত্র একটি ধর্মই টিকে থাকবে। হয় ইসলাম, নয়তো খৃস্টধর্ম। অতএব মুসলমানদের ছাড় দেয়ার কোন সুযোগ নেই। তাদের প্রতি অনুকম্পা দেখানো মানে নিজের গলায় ছুরি চালানো। তাই ইসলামকে কবর দিতেই হবে। এখানে ভক্তি বা বিদ্বেষের কিছু নেই।' অতএব খৃস্টানরা যা করছে সব বুঝেশুনেই করছে। এ জন্যই খৃস্টানদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ ও অর্ন্তকলহ থাকলেও যখন দুনিয়ব্যাপী মুসলিম নিধনের প্রশ্ন আসে তখন তারা এক হয়ে যায়।'

'সুলতান, মুসলমানদের মধ্যে সচেতনতার অভাব বলেই খৃস্টানরা এমনটি করতে পারছে। যদি এই ঘুমন্ত জাতি একবার জেগে উঠে মাথা ঝাড়া দেয় তাহলে কোন অস্ত্রই তাদের ঈমানের সামনে টিকতে পারবে না।'

'খুবই খাঁটি কথা বলেছো। আমরা দুনিয়ার মিথ্যা আড়ম্বর ও লোভ মন থেকে দূর করতে না পারলে খৃষ্টানরা আমাদের এই পাপে ডুবিয়েই ইসলামের সমাধি রচনা করবে।'

খৃষ্টান সেনাপতি ও কমান্ডাররা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সুলতান আইয়ুবী সেনাপতিকে নিয়ে সেখানে গেলেন। তাদের বললেন, 'তোমরা বিনা অপরাধে অসংখ্য মুসলিম নরনারীকে হত্যা করেছো। বেগার ক্যাম্পে এনে বিনা পারিশ্রমিকে মুসলমানদের দিয়ে অমানুষিক কাজ করিয়ে শেষে কাজের অনুপযুক্ত হলে তাদের হত্যা করেছো। এবার বলো এর কি শাস্তি তোমরা চাও?'

খৃষ্টান সেনাপতি ও কমান্ডাররা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো, কেউ সুলতানের অভিযোগ অস্বীকার করতে এগিয়ে এলো না। সুলতান গর্জন করে বললেন, 'এই সব পাপিষ্ঠদের সমুদ্র পাড়ে নিয়ে যাও। সেখানে ওদের হত্যা করে লাশগুলো সমুদ্রে ভাসিয়ে দেবে। আর সাধারণ সৈন্যদের যারা অপরাধ স্বীকার করবে তাদের দামেশকে পাঠিয়ে দাও। অবশিষ্টদের শেষ করে দাও। সাবধান, কোন নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর হস্তক্ষেপ করবে না। তাদের মধ্যে স্বেচ্ছায় যারা শহর ছেড়ে চলে যেতে যায় তাদের কোন বাঁধা দিওনা। যারা এখানে থাকতে চায় তাদের সসম্মানে থাকতে দিবে।'

৮ জুলাই ১১৮৭ সাল। আক্রার ওপর পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম হলো মুসলমানদের। রাতে সুলতান আইয়ুবী সবেমাত্র খাওয়া দাওয়া শেষ করেছেন, এক রক্ষী এসে সংবাদ দিল, 'একজন

গুরুত্বপূর্ণ বন্দী আনা হয়েছে।'

'সে কে?'

'বন্দীর নাম হরমন।'

'কোন হরমন?' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'খৃষ্টানদের গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান? যেমন আমাদের আলী বিন সুফিয়ান?'

'জ্বী, সম্ভবত তিনিই।'

'ঠিক আছে, তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।'

ঘটনা প্রবাহে সম্রাট হরমনের নাম আমরা অনেক বার শুনেছি। এ লোক ষড়যন্ত্র ও কুটনীতিতে খুবই পারদর্শী ছিল। যেসব ইহুদী ও খৃস্টান মেয়েরা মুসলমান এলাকায় গোয়েন্দাগিরী করতে আসতো তাদেরকে ভাল মতো ট্রেনিং দিতেন এই হরমন। তিনি একদল খৃস্টান মেয়েকে ট্রেনিং দেয়ার জন্য আক্রায় অবস্থান করছিলেন। কিন্তু আক্রার পতনের পর শহর ছেড়ে পালাবার সময় সবাই দলসহ ধরা পড়ে যায়।

তিনি এবং তার সঙ্গের মেয়েরা গোপনে শহর থেকে পালাচ্ছিল। দলটিকে দেখে সুলতান আইয়ুবীর এক গোয়েন্দার সন্দেহ হয়। সে তাদের পিছু নেয়। ফটকে পৌঁছলে রক্ষীদের জানায় সে তার সন্দেহের কথা। এক গোয়েন্দা কমাণ্ডার এগিয়ে যায় দলটির দিকে। হরমন তখন ছদ্মবেশে ছিল। তারপরও তাকে দেখেই চিনতে পারে সেই কমান্ডার।

হরমন তখন গ্রাম্য কৃষকের ছদ্মবেশে ছিল। মেয়েরাও কৃষক কন্যার মতোই পোষাকে পরে ফিরে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, আনাজ-তরকারী বিক্রি করতে এসে তারা শহরে আটকা

পড়ে যায়। এখন সুযোগ পেয়ে তারা ফিরে যাচ্ছে আপন গাঁয়ে।

গোয়েন্দা কমান্ডার বললো, 'তুমি খুব দামী উপহার জোগাড় করেছো। এসো, এক্ষুণি ওদের পাকড়াও করতে হবে।'

কমান্ডার কয়েকজন রক্ষী সৈন্যের সহযোগিতা নিয়ে হরমন ও তার সঙ্গীদের কাফেলাটিকে ঘিরে ফেললো। সম্রাট হরমনের সঙ্গে মেয়েদের দলটিই শুধু ছিল না, সঙ্গে সোনাদানাও ছিল প্রচুর। হরমন কমান্ডারের সামনে সোনার পুটলি মেলে ধরে কমান্ডার ও সৈন্যদের লক্ষ্য করে বললো, 'তোমরা এই সোনা ভাগ করে নাও এবং যে মেয়েকে তোমাদের পছন্দ হয় নিয়ে যাও, আমাকে এবং বাকী মেয়েদের ছেড়ে দাও।'

'আমাদের যে সব কটা মেয়েই পছন্দ!' কমান্ডার বললো, 'আমরা সব কটা মেয়েকেই নেবো, সমস্ত সোনাদানাও নেবো, সঙ্গে আপনাকেও সাথে নিয়ে যাবো।'

'ঠিক আছে, তোমরা সব কটা মেয়েকেই নাও, সোনাদানাও নিয়ে যাও, শুধু আমাকে ছেড়ে দাও।'

'তা কি করে হয়? আমার যে আপনাকেই সবচে বেশী পছন্দ হয়।' কমান্ডার রহস্যময় কণ্ঠে বললো হরমনকে।

কমান্ডার হরমনসহ সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সুলতান আইয়ুবীর দরবারে হাজির হলো। সমস্ত সোনাদানা ও মেয়েদেরকে সুলতান আইয়ুবীর কাছে বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় নিল কমান্ডার।

সম্মিলিত খৃস্টান গোয়েন্দা বাহিনীর প্রধান সম্রাট হরমন সুলতান আইয়ুবীর কাছে ছিলেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কয়েদী।

তাকে সুলতান আইয়ুবীর কামরায় হাজির করা হলে সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'হরমন, আমি জানি তুমি ভাল আরবী বলতে পারো!' তাই আমি চাই তুমি এখন আরবী ভাষাতেই কথা বলো। আমি তোমার গুণ, দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করি। তোমার সম্মান আমি যতটুকু বুঝতে পারি অন্য কেউ তা পারবে না। তোমার মর্যাদার কথা বিবেচনা করে আমি তোমার সাথে এমন কিছু কথা বলতে চাই, যা অন্য কারো সাথে বলা আমি সমীচিন মনে করি না।'

'যদি দয়া করে আমার সঙ্গে কথা না বলে আমাকে হত্যা করার হুকুম দেন তাতেই আমি খুশী হবো।' সম্রাট হরমন বললেন, 'আমি জানি, শেষ পর্যন্ত আমাকেও আক্রার জেনারেল ও কমান্ডারদের মত নিহত হতে হবে। তাদের মতো আমার লাশও মাছের আহার হবে। সুতরাং আর কথা বলার প্রয়োজন কি?

'হরমন! তোমাকে হত্যা করা হবে না!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি যাকে হত্যা করতে চাই, তার শুধু মুখের দিকে তাকাই, তার সঙ্গে কখনও কথা বলি না।'

সুলতান আইয়ুবী প্রহরীকে ডাকলেন। বললেন, 'মেহমানের জন্য সরবত নিয়ে এসো।'

হরমন বিস্মিত ও অভিভুত হলেন। তার চোখে মুখে আনন্দের আভা ফুটে উঠলো। তিনি আরবের প্রথা সম্পর্কে ভালমতই জানতেন। কোন শত্রুকে সরবত পরিবেশন করলে বুঝতে হবে, সরবত প্রদানকারী তার মন থেকে শত্রুতা মুছে

ফেলেছে এবং শত্রুর প্রাণ ভিক্ষা দিয়েছে।

প্রহরী তার সামনে সরবতের গ্লাস রাখলে তিনি পলকের জন্য সুলতানের দিকে তাকালেন এবং বুঝে নিলেন সুলতান আইয়ুবী তার সাথে কোন রকম ঠাট্টা ইয়ার্কি করছেন না, সত্যি সত্যি তিনি তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি গ্লাসটি উঠিয়ে নিলেন এবং আনন্দিত চিত্তেই সরবত পান করলেন।

সরবত পান শেষ হলে তিনি গ্লাসটি নামিয়ে রেখে বললেন, 'আমি জানি, আপনি আমাকে কি বলতে চাচ্ছেন। আপনি জানতে চাচ্ছেন, কোন কোন স্থানে আমাদের কত সৈন্য আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।' হরমন বললেন, 'আর আপনি এ বিষয়ও জানতে চাইবেন, তাদের মধ্যে যুদ্ধ করার যোগ্যতা ও আগ্রহ কেমন? হয়তো যুদ্ধের সাজ সরঞ্জাম এবং অস্ত্র সম্পর্কেও আপনার প্রশ্ন থাকতে পারে।'

'না, আমি এসবের কিছুই জানতে চাই না।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'বরং তুমি আমাকেই জিজ্ঞেস করো তোমাদের কোন কোন এলাকায় কত সৈন্য আছে। কারণ আমাদের গোয়েন্দারা তোমাদের প্রাণ কেন্দ্রে মিশে আছে। তোমাদের কত সৈন্য কোথায় আছে, তোমাদের অস্ত্রসম্ভার কেমন আছে সবই আমার জানা। সৈন্য সংখ্যা নিয়ে আমি কখনো দুশ্চিন্তায় ভুগি না। হাতিনে তোমাদের কম সৈন্য ছিল না। কম সৈন্য ছিল আমাদের, এখনতো আরও কমে গেছে। কিন্তু তাই বলে পবিত্র ভূমি থেকে আমাকে বের করে দেবে এমনটি কখনোই ঘটবে না। তুমি বরং এ সংবাদ শুনতে

পারো, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী নিহত হয়েছে, কিন্তু পিছু হটেনি।'

'যদি আপনার সমস্ত কমান্ডার এই কমান্ডারের মত চরিত্রবান হয়, যে কমান্ডার আমাদের এখানে ধরে এনেছে, তবে আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, যত বড় শক্তিই থাকুক আপনাকে এখান থেকে কেউ সরাতে পারবে না।' হরমন বললেন, 'আমি তাদের সামনে যে মেয়েদের ধরেছিলাম, সেই মেয়েদের দিয়েই আমি পাষাণ হৃদয় সেনাপতি ও কেল্লাদারদেরকে মোমের মত গলিয়ে খৃস্টানদের অনুগত বানিয়েছিলাম। আর সোনা এমনই জিনিষ যে জিনিষ শুধু চোখই না, মানুষের বিবেকও অন্ধ করে দেয়। আমি সোনাকে শয়তানের পুঁজি মনে করি। কিন্তু আপনার কমান্ডার সোনার প্রতি দৃষ্টিই দিল না।

আমি মানুষের প্রকৃতিগত দুর্বলতা খুব ভাল বুঝি। আমি জানি, আনন্দ ও বিলাসিতা মানুষের বিবেক খেয়ে ফেলে, মুমীনের ঈমান ধ্বংস করে দেয়। আমি আপনার বিরুদ্ধে এ অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ করেছি। যদি এই দুর্বলতা কখনও কোন সেনাপতির মনে সৃষ্টি হয়ে যায় বা সৃষ্টি করে দেয়া যায় তখন তার ভাগ্যে পরাজয় ছাড়া আর কিছু লেখা হয় না। আমি আপনাদের এখানে বহু গাদ্দার সৃষ্টি করেছিলাম। তাদের মনে শাসন ক্ষমতার নেশা সৃষ্টি করেছিলাম, যে দুর্বলতা মানুষকে ধ্বংস করে দেয়।'

'আমার সৈন্যদের কৃতিত্ব সম্পর্কে তোমার কি মতামত?' সুলতান আইয়ুবী তাকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আপনার সৈন্যদের কৃতিত্ব এটাই, আমরা তাদের যেমন বানাতে চেষ্টা করেছিলাম, তারা তা হয়নি। যদি হতো তবে আজ আপনার সৈন্যবাহিনী এখানে থাকতো না।' হরমন বললেন, 'আর যদি আপনি চরিত্রহীন অকর্মন্য শাসক, আমীর, উজির ও সেনাপতিদের শেষ না করতেন তবে তারা এতদিনে আমাদের কারাগারে বন্দী থাকতো। আমি আপনার প্রশংসা করি এ জন্য যে, আপনি সম্রাট বা বাদশাহদের মতো রাজ্য শাসনের ইচ্ছা করেননি কখনো। যদি আপনি নিজেকে বাদশাহ ভাবতেন তাহলেও আপনি আজ এখানে থাকতে পারতেন না।'

'হরমন!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি তোমার জীবন রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। তুমি এটাও উপলব্ধি করতে পারছো, তোমার প্রতি আমি বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করে দিয়েছি। এখন তুমি আমাকে বলো, আমি কেমন করে আমার সৈন্যদের মনোবল ও কৃতিত্বকে আরও দৃঢ় ও উচ্চ করতে পারি। আমার মৃত্যুর পরও কি করে এই কৃতিত্ব টিকে থাকতে পারে?'

'সম্মানিত সুলতান!' হরমন বললেন, 'আমি আপনার দুরদর্শিতা ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করি। গোয়েন্দাগিরীর ক্ষেত্রে আপনার গোয়েন্দারা যে দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছে সে জন্য আমি আপনাকে উস্তাদ মানি। আপনি বরাবর সঠিক স্থানেই আঘাত হানেন। আপনার গোয়েন্দা সংস্থার ট্রেনিং ও নিয়ম শৃঙ্খলা অতিশয় উন্নত। আপনার সৌভাগ্য যে, আপনি আলী বিন সুফিয়ান ও হাসান বিন আবদুল্লাহর মতো হুশিয়ার গোয়েন্দা অফিসার পেয়েছেন এবং গিয়াস বিলকিসের মতো পুলিশ

অফিসার পেয়েছেন। যতোদিন আপনার পাশে এমন দক্ষ গোয়েন্দা প্রধান ও পুলিশ প্রধান থাকবে ততোদিন ব্যর্থতার গ্লানি আপনাকে স্পর্শ করবে না।

কিন্তু তবুও আমি আপনাকে বলতে বাধ্য হচ্ছি, এ সফলতা শুধু আপনার জীবদ্দশাতেই থাকবে। আমি আপনার জাতির মাঝে যে বিষ ছড়িয়েছি তা ব্যর্থ হওয়ার নয়। আপনি একজন ঈমানদার লোক, সে জন্য আপনি বেদ্বীন ও বেঈমানদের দাবিয়ে রাখতে পেরেছেন। আপনাদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ কে বাঁধিয়েছিল? আমি বাঁধিয়েছিলাম। আমি আপনার জাতির শাসকদের মধ্যে ক্ষমতা, ধনসম্পদ, আনন্দ ও নারীর নেশা ভরে দিয়েছি। আপনার ঈমানের চাবুক সাময়িকভাবে তাদের নেশা দূর করে দিয়েছে ঠিক, কিন্তু যেদিন আপনি থাকবেন না সেদিন আপনার জাতিকে চাবুক মারারও কেউ থাকবে না। তখন আপনার উত্তরসূরীরা আবার সেই নেশায় বিভোর হয়ে যাবে। কারণ আমি না থাকলেও আমার উত্তরসূরীরা আপনার জাতির মধ্যে এ নেশা জাগাতেই থাকবে।

সম্মানিত সুলতান! এই যুদ্ধ, যা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি, সেটি আমার ও আপনার অথবা আমাদের সম্রাট ও আপনার যুদ্ধ নয়। এটা গীর্জা ও মসজিদের যুদ্ধ– যা আমাদের মৃত্যুর পরও চালু থাকবে। প্রয়োজন না পড়লে আমরা সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করবো না। হয়তো এমন সময় আসবে, যখন আমরা আপনাদের কোন দেশ দখলও করতে যাবো না। আমরা মুসলমানদের মন-মগজ, আদর্শ ও চরিত্র দখল করবো। আমরা মুসলমানদের

ধর্মীয় বিশ্বাসকে অবরোধ ও নিয়ন্ত্রণ করবো।

আমাদের এই মেয়েরা আর আমাদের স্বর্ণ, ধনসম্পদ ও আমাদের কৃষ্টি-সভ্যতার আকর্ষণ, যেটাকে আপনি মোহ ও নির্লজ্জতা বলে থাকেন, এই মোহ ও অশ্লীলতাই ইসলামের প্রাচীরকে ধ্বংস করে দেবে। আপনি লিখে নিতে পারেন, আমি বলছি, সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন মুসলমানরা তাদের কৃষ্টি ও সভ্যতাকে ঘৃণা করতে শিখবে। তারা খৃস্টান সভ্যতাকে ভালবাসতে থাকবে। হয়তো সে সময়টা আপনি দেখতে পাবেন না, আমিও দেখে যেতে পারবো না। আমাদের আত্মা ও উত্তরসূরীরা তা অবশ্যই দেখবে।'

সুলতান আইয়ুবী জার্মান বংশোদ্ভূত সম্রাট এবং সম্মিলিত খৃস্টান গোয়েন্দা বাহিনী প্রধান হরমনের কথা গভীর মনোযোগের সাথে শুনছিলেন। হরমন বললেন, 'আমরা পারস্য, আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষ কেন দখল করতে যাইনি? আমরা আমাদের আক্রমণের লক্ষ্য কেন আরবের ওপর স্থির করেছি? এটা এ কারণে যে, সমস্ত মুসলমানরাই এদিকে মুখ করে ইবাদত বন্দেগী করে। আরবেই অবস্থিত মুসলমানদের প্রাণকেন্দ্র কাবাঘর। আমরা মুসলমানদের এই কেন্দ্রের প্রতি ঝোঁক ও আগ্রহ শেষ করে দিতে চাই।

আপনাদের বিশ্বাস, আপনাদের প্রিয় রাসুল (সা.) মসজিদুল আকসা থেকে সাত আকাশে ভ্রমণ করেছিলেন। আমরা সেই মসজিদের মধ্যে মহান ক্রুশ রেখে দিয়েছি। আমরা সেখানকার অধিবাসীদের বলছি, মুসলমানদের বিশ্বাস ভুল। তাদের রাসুল

(সা.) কখনও মসজিদুল আকসায় আসেননি এবং এখান থেকে মেরাজেও যাননি। যদি মুসলমানদের দাবী সত্য হতো তবে মসজিদুল আকসা তাদের দখলেই থাকতো। মসজিদুল আকসার কর্তৃত্ব খৃস্টানদের হাতে তুলে দেয়ার মানে হচ্ছে, আল্লাহর মনোনীত ধর্ম ইসলাম নয় বরং বাইবেলই আল্লাহর মনোনীত কিতাব আর খৃস্টান ধর্মই আল্লাহর মনোনীত ধর্ম।'

'হরমন!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি তোমাদের প্রচেষ্টা ও সংকল্পকে প্রশংসা করি। আপন ধর্মের প্রতি প্রত্যেকের এমন আনুগত্যই করা উচিত যেমন তুমি করছো। সেই জাতিই বেঁচে থাকে, যে জাতি তার ধর্ম ও সামাজিক-মূল্যবোধকে সম্মান দেয়। তারা তাদের মনের চারদিকে ধর্মের শিক্ষা দিয়ে এমন বুহ্য রচনা করে নেয়, অন্য কোন ধর্ম, মতবাদ বা দর্শন তার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে না।

আমি জানি, ইহুদীরা আমাদের এখানে সুগভীর ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। তারা মূলতঃ তোমাদের সহযোগিতা করছে। আমি এখন বায়তুল মোকাদ্দাস যাচ্ছি শুধু এই কারণে যে, এর সাথে আমাদের ধর্মীয় আবেগ জড়িয়ে আছে। আমাদের প্রিয় নবী (সা.)কে আল্লাহতায়ালা এখান থেকেই মিরাজে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি এখন এটাকে খৃষ্টান আধিপত্য থেকে মুক্ত করে প্রমাণ করবো, তোমার ধারনা ভুল। আল্লাহর একমাত্র মনোনীত জীবন বিধান ইসলাম ছাড়া আর কিছু নয়।'

'তারপরে আপনি কি করবেন?' হরমন বললেন, 'তারপরে আপনি এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেবেন। মসজিদুল আকসা

আবার আমাদের অধিকারে চলে আসবে। আমাদের এবাদতের স্থান হবে। আমি যে ভবিষ্যতবাণী করছি তা আপনার জাতির স্বভাব চরিত্র দেখে বলছি। আমরা আপনার জাতিকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দেবো। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে খন্ডরাজ্যে পরিণত করবো। তারপর তারা যেন একে অপরের শত্রু হিসেবে দাঁড়িয়ে যায় তার ব্যবস্থা করবো। তখন আর ফিলিস্তিন উদ্ধারের কোন প্রশ্নই উঠবে না।

ইহুদীরা তাদের ছেলে মেয়েদের মধ্যে যৌন আনন্দ বাঁধাহীন করে দিয়েছে। আমরাও তাদের কাছ থেকে এই শিক্ষা ভালমতোই রপ্ত করে নিয়েছি। এই শিক্ষা আপনার জাতির মধ্যেও সংক্রামিত হতে শুরু করেছিল। কিন্তু আপনি তাদের সামনে এমন প্রাচীর তুলে দিলেন যে, তারা আর এ পথে এগুতে পারলো না। কিন্তু আপনি এ কথা অবশ্যই স্বীকার করবেন, একদিন আপনাকে মরতে হবে। আর কোন জাতির মধ্যে প্রতিদিন নুরুদ্দিন জঙ্গী ও সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর জন্ম হয় না।'

সুলতান আইয়ুবী স্মিত হেসে হরমনের সাথে করমর্দন করে বললেন, 'তোমার কথা খুবই মূল্যবান। আমি তোমাকে দামেশকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, সেখানে তুমি রাজবন্দী হিসেবে সসম্মানে থাকবে।'

'আর এই মেয়েরা, যারা আমার সাথে আছে?'

সুলতান আইয়ুবী একটু চিন্তায় পড়ে গেলেন। একটু পরে বললেন, 'মেয়েদের যুদ্ধবন্দী হিসাবে রাখার কোন ব্যবস্থা

আমাদের এখানে নেই। ওরা গোয়েন্দা, তাই ওদের ছেড়েও দেয়া যায় না। ওদের হত্যা করে সমুদ্রে ফেলে দেয়াই উত্তম হবে।'

'সম্মানিত সুলতান! এরা খুব সুন্দরী এবং চৌকস মেয়ে।' হরমন বললেন, 'যদি আপনি এদের এক নজর দেখেন তবে তাদেরকে আপনি হত্যা করতে পারবেন না। এমনকি এদেরকে কারাগারে পাঠাতেও আপনার বিবেক সায় দেবে না। আপনার ধর্মে দাসীকে বিয়ে করার বিধান আছে। আপনি এদেরকে দাসী হিসাবে আপনার হেরেমখানায় রেখে দিন, তাতে ওদের অন্তত প্রাণটা তো রক্ষা পাবে!'

'আমাদের ধর্মে এমন বিলাসিতার কোন স্থান নেই।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি আমার ঘরে কেন, কোন মুসলমানের ঘরেই কোন কাল সাপ পুষতে দিতে পারি না।'

'কিন্তু এদের ব্যাপারে কি আর কোন চিন্তা করা যায় না?' অনুনয় ভরা দৃষ্টি নিয়ে হরমন বললেন, 'এদের শিশুকাল থেকে পেলেপুষে আমি বড় করেছি। আমার মতো পাপীকেও যদি আপনি ক্ষমা করতে পারেন, ওরা তো আমার শিশুর তুল্য, ওদের প্রাণ রক্ষা পায় এমন কোন ব্যবস্থা কি আপনি করতে পারেন না?'

'ঠিক আছে, এতো করে যখন বলছো, আমি ওয়াদা করছি, ওদের আমি হত্যা করবো না।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'কিন্তু ওদেরকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। আমি তোমার ওকালতির প্রশংসা করছি, ওদের প্রতি তোমার মায়া ও স্নেহ

দেখে। কিন্তু তোমার চালাকি আমি ঠিকই ধরতে পেরেছি। তুমি এই সুন্দর নাগিনীগুলোকে আমার জাতির মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাও। কিন্তু আমি তোমার এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হতে দিতে পারি না। ওদেরকে বলো, ওরা আক্রা ছেড়ে চলে যাবে। আর কোনদিন কোন মুসলিম এলাকায় প্রবেশ করবে না। যদি কোন মুসলিম এলাকায় ওদের কাউকে চোখে পড়ে তবে অবশ্যই তাকে হত্যা করা হবে।'

সুলতান আইয়ুবী কয়েক দিনেই আক্রাতে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করে প্রশাসনিক কাজকর্ম শুরু করেন। মসজিদগুলো আবার সাফসুতরো ও পরিষ্কার করে জীবন্ত করে তোলেন। যে সব গনিমতের মাল পাওয়া গিয়েছিল তার অধিকাংশ নিজ সৈন্যদের মধ্যে বিতরণ করে দেন। কিছু দান করেন সেখানে অবস্থানরত গরীব মুসলমানদের মধ্যে। কিন্তু এসব করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যও তিনি ফিলিস্তিনের কথা ভুলে যাননি। তাঁর মাথায় কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছিল ফিলিস্তিন জয়ের স্বপ্ন।

তিনি তাঁর কামরায় বসে আছেন। তার আঙ্গুল খেলা করছে মানচিত্রের ওপর। সেই নকশার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল তার আঙুল যেখানে লেবানন ও ইসরাইলের মানচিত্র অংকিত। তাঁর চিন্তা ভাবনা আচ্ছন্ন করে আছে বায়তুল মোকাদ্দাস। তিনি তাঁর সৈন্য বাহিনী সাজাচ্ছিলেন সেই মানচিত্রের ওপর। কমান্ডো বাহিনী কোথায় কোথায় অবস্থান করবে, কোন পথে এগুবে পদাতিক বাহিনী, অশ্বারোহী ও তীরন্দাজরা কোথায় থাকবে

এসব ঠিক করছিলেন তিনি। গভীর মনোযোগের সাথে তাকিয়েছিলেন মানচিত্রের ওপর।

'সম্মানিত সুলতান।' কামরায় প্রবেশ করে মৃদুকণ্ঠে সুলতান আইয়ুবীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন গোয়েন্দা প্রধান হাসান বিন আবদুল্লাহ।

'হাসান!' নকশা থেকে দৃষ্টি না সরিয়েই সুলতান বললেন, 'আমাদের এখন তেমন সময় সুযোগ নেই যে, সব কথা নিয়ম কানুন রক্ষা করে বলবো। এমন সময় আমি তখন পাবো যখন আমি বিজয়ীর বেশে বায়তুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ করবো। কি জন্য এসেছো বলো।'

'ত্রিপোলী থেকে সংবাদ এসেছে, সম্রাট রিমান্ড মারা গেছেন।'

'তিনি কি আহত ছিলেন?'

'না, সুলতানে মুয়াজ্জম!' হাসান বিন আবদুল্লাহ বললেন, 'তিনি সহি সালামতেই ত্রিপোলী পৌঁছে ছিলেন। কিন্তু পরের দিন তাকে তার কামরায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। মনে হয় পরাজয়ের শোক সইতে না পেরে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।'

'কিন্তু তাকে তো তেমন আত্মাভিমানী বলে মনে হয়নি!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আগেও তিনি কয়েকবার পরাজিত হয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়েছিলেন। তিনি আমাকে হত্যা করার জন্য তিন বার ঘাতক বাহিনী ভাড়া করেছিলেন। এমন তো ঘটেনি; সেই ঘাতক বাহিনীর ছোবল খেয়েছেন তিনি? যাই হোক, তাঁর মৃত্যুতে আমার খুব দুঃখ হচ্ছে। আল্লাহর ফয়সালা

পাল্টানোর সাধ্য আমাদের কারো নেই। আমার দুঃখ হচ্ছে, বীরের মতো যুদ্ধক্ষেত্রে মরার ভাগ্যও লোকটার হলো না।'

ঐতিহাসিকগণ ত্রিপোলীর সম্রাট রিমান্ডের মৃত্যু সম্পর্কে একাধিক ভিন্নমত পোষণ করেছেন। কেউ বলেছেন, তিনি হার্টের রোগী ছিলেন। পরাজয়ের শোক সইতে না পেরে সম্ভবত হার্ট এ্যাটাকে মরেছেন। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক বলেছেন, ফেদাইন খুনী গ্রুপের সাথে দেনা পাওনা নিয়ে তার বিরোধ ছিল। তারাই তাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করেছিল।

সম্রাট রিমান্ড হঠকারী ও হিংসুটে শাসক ছিলেন। ষড়যন্ত্রে ছিলেন ওস্তাদ। মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ সৃষ্টিতে তার হাত ছিল। কেবল মুসলমান নয়, খৃস্টান শাসকদের পরস্পরের মধ্যেও ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়াতে দ্বিধাবোধ করতেন না তিনি। তাই খৃস্টান সম্রাটরা কেউ তাকে বিশ্বাস করতেন না।

হাসান আল সাবাহর ফেদাইন খুনী চক্রের সাথে ছিল তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সুলতান আইয়ুবীকে একাধিকবার এই খুনী চক্রের মাধ্যমে হত্যার চেষ্টা করেছেন তিনি। একাধিক খৃষ্টান সম্রাটের বিরুদ্ধেও এই খুনী চক্রকে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, তারা সফল হতে পারেনি। কিন্তু তার হত্যা প্রচেষ্টার ষড়যন্ত্র ধরা পড়ে গিয়েছিল। এতে তিনি খৃস্টান শিবিরে ব্যাপকভাবে নিন্দিত হয়েছিলেন।

কিন্তু মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনী গঠনের সময় তারা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে তার অপকীর্তি ভুলে তাকে দলে টানে। সম্রাট রিমান্ড সম্মিলিত বাহিনীর সাথে একাত্মতা প্রকাশ

করে মহান ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ নিয়ে হাতিনের রণাঙ্গনে গিয়েছিলেন। কিন্তু যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে যুদ্ধ শুরুর পরদিনই তিনি পালিয়ে আসেন। পরের দিন তাকে তার কামরায় মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তার জীবনের শেষ রাতে ফেদাইন নেতা শেখ মান্নান তার কাছে ছিল বলে জানা যায়।

তার আগে আরেক প্রসিদ্ধ খৃস্টান শাসক সম্রাট বিলডনও মারা গিয়েছিলেন। এই সম্রাট ফ্রান্সের রণপ্রিয় শাসক ছিলেন। বায়তুল মোকাদ্দাস তাঁর শাসনাধীন ছিল। সম্রাট বিলডন যুদ্ধ বিদ্যায় খুব দক্ষ ছিলেন। তিনি ভাল করেই জানতেন, সুলতান আইয়ুবী বায়তুল মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে চেষ্টা করবেন।

তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসকে বাঁচানোর জন্য শক্তিশালী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন। তিনি তার গোয়েন্দা বাহিনীকেও যথেষ্ট শক্তিশালী করে সমস্ত মুসলিম রাজ্যগুলোতে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তারা যে কেবল গোয়েন্দাগিরী করতো তাই নয়, সুযোগ পেলে নাশকতামূলক কাজও আঞ্জাম দিত। তারা মুসলিম অঞ্চল সমূহের দুস্কৃতকারীদের সার্বিক সহায়তা দিত যাতে সেখানে সর্বদা অস্থিরতা বিরাজ করে। তারা মুসলিম অঞ্চলের শাসকদের মধ্যেও গাদ্দার সৃষ্টির জন্য সর্বদা তৎপর থাকতো।

সম্রাট বিলডনের যোগ্যতার সবচে বড় মাপকাঠি, তিনি ইয়াজউদ্দিন, সাইফুদ্দিন ও গুমাস্তগীনকে একত্রিত করে তাদেরকে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন।

এই তিন মুসলিম শাসক সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে সামরিক জোট গড়ে তুলেছিল। বিলডন তাদের সব রকম যুদ্ধের অস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম সরবরাহ করে তাদের চাঙ্গা করে রাখতেন। শাসকদের অনুগত রাখার জন্য নিজের গোয়েন্দা বাহিনী দিয়ে নিয়মিত তাদের সরবরাহ করতেন মদ, সোনা-রূপা ও সুন্দরী নারী। এই মেয়েরা সেই সব শাসকদের মন-মগজ সর্বদা আচ্ছন্ন করে রাখতো। মুসলিম শাসকদের একান্ত বাধ্য করে রাখার তার এ কৌশল যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল।

সম্রাট বিলডনের বয়স হয়েছিল। হাতিন যুদ্ধের কিছুদিন আগে বার্ধক্যজনিত কারণে তিনি মারা যান। তার স্থলে গে অব লুজিয়ান বায়তুল মোকাদ্দাসের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন।

সুলতান আইয়ুবী পৃথিবীর ইতিহাসে কমান্ডো ও গেরিলা আক্রমণে এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। আজ পর্যন্ত সুলতান আইয়ুবীর কমান্ডো বাহিনী এ জন্যই ইতিহাস হয়ে আছে। কিন্তু কমান্ডো আক্রমণের দুর্বল দিক হচ্ছে, এ আক্রমণ করে শত্রুর বিস্তর ক্ষতি সাধন এমনকি শত্রুকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব হলেও কোন এলাকা দখল করা বা দীর্ঘ সময় সে এলাকা দখলে রাখা সম্ভব হয় না। কারণ কমান্ডো বাহিনী থাকে ক্ষুদ্র। তারা ঝড়ের বেগে এসে আবার ঝড়ের বেগেই হারিয়ে যায়। যাওয়ার আগে হয়তো সবকিছু তছনছ করে দিয়ে যায়।

সুলতান আইয়ুবী কমাণ্ডো বাহিনীর জন্য নতুন করে যুদ্ধের ছক তৈরী করলেন। এই পরিকল্পনায় তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসের আশপাশের দূর দূরান্ত পর্যন্ত কমান্ডো বাহিনী

ছড়িয়ে দিলেন। তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, 'তোমরা ওইসব এলাকা থেকে খৃস্টানদের বেদখল ও বিতাড়িত করবে। সাগর তীরের কেল্লাগুলো দখল করে নেবে। কেল্লাতে যে সব অস্ত্রশস্ত্র ও খাদ্যশস্য পাবে সেগুলো কোন নিরাপদ স্থানে হেফাজত করবে। আমাদের গোয়েন্দারা প্রতি মুহূর্তে তোমাদের তৎপরতা ও অগ্রগতির খবর রাখবে।

কোন কেল্লা দখল হয়ে গেলেই তা হেফাজত করার মতো সৈন্য আমি সেখানে পাঠিয়ে দেবো। ওরা পৌঁছে গেলে কেল্লা ওদের হাতে বুঝিয়ে দিয়ে তোমরা এগিয়ে যাবে অন্য এলাকায়। এভাবে নিয়মিত যুদ্ধে না গিয়ে ফিলিস্তিনের আশপাশের সমস্ত এলাকা যতটুকু সম্ভব আমি আগেই দখল করে নিতে চাই।'

সুলতান আইয়ুবী তাঁর সৈন্যদের সুস্পষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে দিলেন। এটাই ছিল সুলতানের আসল শক্তি। তিনি কি করতে চান সেটা প্রতিটি সেনাপতি ও সৈন্যের অন্তরে গেঁথে দিতেন তিনি। তখন সুলতানের মতোই স্থির লক্ষ্যপানে এগিয়ে চলতো কাফেলার প্রতিটি সৈনিক। চিন্তার এ ঐক্য তাদের মধ্যে গড়ে তুলতো শীশাঢালা দৃঢ়তা।

তিনি সেনাপতিদের বলে দিলেন কে কোন এলাকা দখল করবে এবং কোথায় অবস্থান করবে। ওই সব এলাকা ও শহরের বর্তমান অবস্থাও তিনি তাদের সামনে তুলে ধরতেন। তিনি সেনাপতিদের বললেন, 'বিজয়ের পর তোমাদের কাজ হবে ওই এলাকার মুসলমানদের দুর্দশার অবস্থা সৈন্যদের

সামনে তুলে ধরা। তোমরা তাদের নিয়ে যাবে মুসলিম পল্লীগুলোতে। নিজের চোখে ওরা দেখবে সেখানকার মুসলমানরা এতদিন কি দুঃসহ জীবন যাপন করেছে। তাদের দেখাবে সেখানকার বিরাণ হয়ে যাওয়া মসজিদগুলো, যেগুলো খৃস্টানরা ধ্বংস ও পদদলিত করেছে। সেখানকার মুসলমান নারীদের দুর্দশার করুণ চিত্র তাদের দেখতে দেবে, যাদের সম্ভ্রম লুণ্ঠন করেছে অসভ্য খৃস্টানরা। ভাল করে দেখাবে, আমাদের শত্রুরা কত নিষ্ঠুর, তারা কত অমানবিক।'

সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য বাহিনী অল্প সংখ্যক হওয়ার পরও তারা যে বড় বড় বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করতো তার মূলে কাজ করেছে সুলতানের এই টেকনিক। মুসলিম মুজাহিদরা যখন সচক্ষে দেখতো খৃষ্টানদের অপকর্ম, তখন তাদের মধ্যে জেগে উঠতো ক্ষোভ ও ঘৃণা। এই অন্যায়ের প্রতিবিধান ও প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা পাগলপারা হয়ে যেতো। এভাবেই তারে অন্তরে জ্বলে উঠতো প্রেরণার নতুন চেরাগ। স্বজাতির এই করুণ দৃশ্য দেখার পর এই সব সৈন্যরা যখন খৃস্টানদের মুখোমুখি হতো তখন শত্রুর ওপর তারা সাক্ষাত অভিশাপ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো।

এই পরিকল্পনা দিয়ে সৈন্যদের পাঠিয়ে দেয়ার পর সুলতান আইয়ুবী প্রতিদিনই খবর পেতে লাগলেন, 'আজ অমুক এলাকার পতন ঘটেছে। অমুক এলাকা মুজাহিদরা পরিপূর্ণ দখল করে নিয়েছে। অমুক জায়গায় খৃস্টান বাহিনী মুসলিম সৈন্যদের ধাওয়া খেয়ে পিছু হটছে।'

এভাবেই সুলতান আইয়ুবীর সৈন্য ও কমান্ডোরা সব রকম আরাম হারাম করে, ঘুম ও বিশ্রাম ত্যাগ করে ক্রমশ সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

একদিন সুলতান আইয়ুবী নকশার ওপর চোখ রেখে গভীর মগ্ন হয়ে তাঁর পরিকল্পনা খতিয়ে দেখছিলেন। কখনো সেই পরিকল্পনায় সামান্য রদবদল করছিলেন। তিনি নকশাটি তাঁর তালুতে নিয়ে উপস্থিত কমান্ডার, সেনাপতি ও উপদেষ্টাদের পরবর্তী প্ল্যান বুঝিয়ে দিচ্ছেন, এমন সময় বাইরে শোরগোল শোনা গেল।

'আমি তোমাদের সুলতানকে হত্যা করবো। তোমরা খৃস্টানদের পূজারী। আমাকে ছেড়ে দাও। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার।'

এ সব কথা এক লোকই বলছিল। এ সময় ভেসে এলো আরেকটি কণ্ঠ, 'ওকে এখান থেকে নিয়ে যাও। সুলতান বিরক্ত হবেন।'

অন্য একটি কণ্ঠ চিৎকার করে বললো, 'মেরে ফেলো ওকে। জীবনের মত শেষ করে দাও। বেয়াদপ। কত বড় আস্পর্ধা তার, সুলতানকে কটাক্ষ করে কথা বলে। সুলতানকে হত্যা করতে চায়।'

'ওর মাথায় পানি ঢালো।' কয়েকজন মিলিত কণ্ঠে বললো, 'বেচারা পাগল হয়ে গেছে।'

সুলতান আইয়ুবী দৌড়ে বাইরে গেলেন। তিনি মনে করেছিলেন, কোন খৃষ্টান কয়েদী হবে। কিন্তু তিনি দেখলেন, এ

লোক তাঁরই সেনাবাহিনীর এক কমান্ডার। ওর দুটি হাতই রক্তাক্ত, কাপড়গুলো রক্তে রঞ্জিত। তিনি দেখতে পেলেন, কমান্ডারের চোখ রক্তের মতো লাল। তার ঠোঁটের পাশ দিয়ে জাবরের ফেনা বের হচ্ছে। তাকে কয়েকজন সৈন্য শক্ত করে ধরে রেখেছে, তবুও তাকে কাবু করা যাচ্ছে না।

'ছেড়ে দাও ওকে।' সুলতান আইয়ুবী গর্জন করে বললেন।

'সুলতান! এখানে এসে আপনার সমস্ত সৈন্য লজ্জাবোধ হারিয়ে ফেলেছে। জাতির যে গুরু দায়িত্ব তারা কাঁধে তুলে নিয়েছে সে সম্পর্কে তারা বেখেয়াল হয়ে পড়েছে। নইলে কাফেররা কেমন করে জীবিত ফিরে যায়? আপনি আমাদের সুলতান হয়ে বসে আছেন। এদিকে মুসলমান নারী ও শিশুদের কি অবস্থা আপনি কি দেখেছেন? যারা খৃস্টানদের কাছে বন্দী ছিল শুনেছেন তাদের কান্না? তাহলে কিসের সুলতান আপনি। আপনার কি অধিকার আছে জাতির সুলতান হয়ে বসে থাকার?'

সুলতানের এক রক্ষী ছুটে গিয়ে কমান্ডারের মুখ চেপে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গেলো কমান্ডারের। কমান্ডার রক্ষীর বাহু ধরে এমন জোরে মাথার উপর তুলে সামনের দিকে ছুঁড়ে মারলো যে, রক্ষী সুলতান আইয়ুবীর সামনে গিয়ে আছড়ে পড়লো।

'ওকে বলতে দাও। খবরদার! কেউ ওর কথায় বাঁধা দিতে যেয়ো না।' সুলতান আইয়ুবী আর একবার গর্জন করে উঠলেন। তারপর কণ্ঠস্বর নরম করে বললেন, 'সামনে এসো বন্ধু। বলো, কেন এরা তোমাকে ধরে এনেছে?'

এই কমান্ডার উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল এ জন্য যে, খৃষ্টানদের হাতে বন্দী মুসলমানদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব পড়েছিল তার উপর। মুক্ত মুসলমানদের খাবার পৌঁছানো, তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেয়া এসব কাজে যে শত শত সৈন্য ব্যস্ত ছিল, সে ছিল তেমনি এক বাহিনীর কমান্ডার।

এই কমান্ডার নির্যাতীত মুসলমানদের ঘরে ঘরে গেছে, তাদের মুখ থেকে শুনেছে খৃস্টানদের নির্যাতনের লোমহর্ষক বিবরণ, দেখেছে তাদের অশ্রুভরা বেদনার্ত চোখ। এসব দেখেশুনে এমনিতেই তার মন ছিল বিষন্ন। কষ্টে তার বুকের ভেতর ক্রমাগত রক্তক্ষরণ হচ্ছিল। তারপর দেখলো সেই হৃদয়বিদারক দৃশ্য, যা দেখে তার মাথা খারাপ হয়ে গেল।

সেদিন কমান্ডার তার সৈন্যদের নিয়ে একটি পরিত্যক্ত মসজিদ পরিস্কার করতে গেল। মসজিদে ঢুকেই দেখতে পেলো মসজিদের ভেতর পড়ে আছে দুই মুসলিম মেয়ের উলঙ্গ ও ক্ষতবিক্ষত গলিত লাশ। এই বিভৎস দৃশ্য কমান্ডার সইতে পারলো না।

যে সব সৈন্যরা মসজিদ পরিস্কার করছিল, লাশ দুটো বের করার সময় তাদের চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো। তাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো, 'আমাদের বোন ও কন্যাদের যেখানে এমন অবস্থা সেখানে সুলতান কি করে কাফেরদেরকে এখান থেকে নিরাপদে চলে যাওয়ার আদেশ দিতে পারেন? কিসাসের নিয়ম কি পাল্টে গেল? খুনের বদল খুন করার হক কি আমাদের

নেই? তাহলে আমরা কেন খৃস্টানদের নিরাপদে আপনজনদের কাছে চলে যাওয়ার সুযোগ দেবো?'

কমান্ডারের মাথা আগে থেকেই গরম হয়ে ছিল। সৈনিকের এ কথায় তার মাথায় রক্ত উঠে গেল। চোখ হয়ে উঠলো রক্তাভ। সে সগতোক্তি করে বললো, 'না, না, এ হতে পারে না। আমরা এর বদলা নেবো। কোন খুনী খৃস্টানকেই এখান থেকে জীবন নিয়ে পালাতে দেবো না। রক্তের বদল রক্ত চাই।'

সে যখন এসব বলছিল তখন মসজিদের সামনের রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল পনেরো বিশজনের একটি ছোট্ট কাফেলা। কাফেলার সবাইমেয়ে। একদল সৈনিক তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

সৈনিকদের পাহারায় মেয়েদের এগিয়ে যেতে দেখেই সে বুঝলো, এরা সবাই খৃস্টান মেয়ে। কোন উত্তেজিত মুসলমান যেন তাদের গায়ে হাত তুলতে না পারে সে জন্যই তাদের পাহারা দিয়ে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে।

কমান্ডার এগিয়ে গেল কাফেলার দিকে। সৈন্যদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'এই মেয়েগুলো কারা? তোমরা ওদের পাহারা দিয়ে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?'

এক মুসলিম কমান্ডার তাদের পথ আগলে দাঁড়ানোয় সৈন্যরা ভাবনায় পড়ে গেল। এ ধরনের প্রশ্নেরও কোন হেতু খুঁজে পেলো না ওরা। ওরা তাকালো কমান্ডারের রক্তচক্ষুর দিকে। এরপর তাকালো ভীতশঙ্কিত মেয়েদের দিকে।

রক্ষীদের একজন কমান্ডারের প্রশ্নের জবাবে বললো, 'এই মেয়েগুলো খৃস্টান গোয়েন্দা। এরা মিশর ও সিরিয়ায় গাদ্দার ও মুনাফেক সৃষ্টিতে লিপ্ত ছিল। এদেরকে আক্রা থেকে বের করে দেয়ার হুকুম হয়েছে। আমরা ওদের এলাকার সীমানা পার করে দিতে যাচ্ছি।'

কমান্ডার বিস্মিত হয়ে বললো, 'কি বলছো তুমি? ওরা গোয়েন্দা জানার পরও তোমরা ওদের ছেড়ে দেবে? তুমি ঠিক জানো, এরা খৃস্টান?'

'জানবো না কেন? আমাদের রক্ষীরা এদের পাকড়াও করে সুলতানের দরবারে হাজির করেছিল। এদের সরদার হরমনও ধরা পড়েছে এদের সাথে। এরা সবাই খৃস্টান। সুলতান আইয়ুবী এদের নেতা হরমনকে বন্দী করে রেখেছেন। তবে মেয়েদের ব্যাপারে আদেশ দিয়েছেন, তাদেরকে শহর থেকে দূরে কোন খৃস্টান এলাকায় রেখে আসতে। তিনি চান না, এই মেয়েদের কেউ আক্রায় থাকুক।'

'তোমরা কি তাদেরকে সত্যি জীবিত রেখে আসবে?' কমান্ডার জিজ্ঞেস করলো।

'হ্যাঁ, আমাদেরক তাই আদেশ করা হয়েছে।'

'এরা কি আমাদের সেই বোনদের চেয়ে বেশী পবিত্র ও সম্মানিত, যে বোনদের উপর নির্বিচারে বর্বর অত্যাচার চালানো হয়েছে। যাদেরকে বন্দী করে পশুরা ওদের বিবস্ত্র করেছে, সম্ভ্রম নষ্ট করেছে এবং পরে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে?'

সিপাইটি দুঃখিত স্বরে বললো, 'এ প্রশ্নের কোন জবাব

আমার কাছে নেই আর এটা আমার বিষয়ও নয়। আমি শুধু জানি, আমাকে হুকুম করা হয়েছে ওদের নিরাপদে শহর পার করে দিতে, আমি তাই করছি।'

কমান্ডার সহসা তলোয়ার উন্মুক্ত করে মেয়েদের দিকে ছুটে গেল এবং চিৎকার করে বলতে লাগলো, 'খোদার কসম, আমি কাউকে ছাড়বো না, আমি কারো হুকুমের গোলাম নই।'

সে তলোয়ার এত দ্রুত চালালো যে চোখের পলকে তিন চার জন মেয়েকে হত্যা করে ফেললো। রক্ষীরা দৌড়ে তাকে বাঁধা দিতে গেল। মেয়েরা চিৎকার করে এদিক ওদিক পালাতে লাগলো। ক্ষিপ্ত কমান্ডার এক মেয়ের দিকে ধেয়ে যাচ্ছিল, এক সৈন্য তাকে বাঁধা দিতে গেল। উন্মত্ত কমান্ডার সঙ্গে সঙ্গে সে সৈন্যের পেটে তলোয়ার ঢুকিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে অন্য রক্ষীরা সাবধান হয়ে গেল। তারা কয়েকজন মিলে তাকে ঘিরে ফেললো।

মেয়েরা যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছিল। কয়েকজন রক্ষী ছুটে গিয়ে তাদের তাড়িয়ে এনে আবার একত্রিত করলো। কমান্ডার সৈন্যদের সাথে মোকাবেলা করতে না পেরে একসময় মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

কমান্ডারকে হত্যা করা সৈন্যদের উদ্দেশ্য ছিল না, তারা বেহুশ কমান্ডারকে ওভাবে ফেলে রেখে মেয়েদের নিয়ে সরে পড়লো ওখান থেকে।

একটু পর কমান্ডারের হুশ ফিরে এলো। সে তলোয়ার তুলতে গেলে তার এক সৈনিক তা কেড়ে নিতে গেল। কিন্তু

সে ক্ষিপ্রগতিতে তলোয়ার ছিনিয়ে নিয়ে এক দিকে ছুটে পালালো। পাগলের মত সে শহরময় ছুটছিল আর চিৎকার করছিল, 'আমি বেঈমান নই। কাউকে ক্ষমা করবো না আমি।'

পথে সে আরো কয়েকজন খৃষ্টানের ওপর আক্রমণ চালালো। সামনে যাকে পেলো তাকেই হত্যা করলো।

এ অবস্থা দেখে তার সঙ্গী সৈন্যরা জড়ো হয়ে তাকে ঘিরে ফেলে তার কাছ থেকে তলোয়ার কেড়ে নিলো। তারপর তারা তাকে টেনে হিঁচড়ে সুলতান আইয়ুবীর অফিসের দিকে নিয়ে গেল।

সুলতান আইয়ুবী তখন অফিসারদের সাথে যুদ্ধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। সুলতানের রক্ষীরা তাকে আটক করলো। সৈন্যদের কাছ থেকে শুনলো, এ লোক আইন লংঘন করেছে। সুলতানের আদেশ অমান্য করেছে। নিরস্ত্রদের ওপর হাত উঠিয়েছে। বিনা কারণে খৃস্টানদের হত্যা করেছে।

তারা ক্ষিপ্ত কমান্ডারকে শান্ত হতে বললো। কিন্তু কমান্ডার তখনো চিৎকার করে যাচ্ছে, 'আমি সুলতানকে হত্যা করবো। তোমরা খৃস্টানদের পূজারী। আমাকে ছেড়ে দাও। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার।'

তার চিৎকার শুনে সুলতান আইয়ুবী বের হয়ে এলেন। তিনি সমস্ত ঘটনা মনযোগ দিয়ে শুনলেন। কমান্ডারের উত্তেজিত গালাগাল ও কথাবার্তা শুনে সবাই ভয় পেয়ে গেল। তারা ভাবছিল, সুলতান তাকে মৃত্যুদন্ড দেবেন। যদি মৃত্যুদন্ড

নাও দেন, তাকে যে কারাগারে পাঠাবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তিনি এর কিছুই করলেন না, বরং তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ভেতর চলো।'

তিনি তাকে কামরায় নিয়ে ঠান্ডা সরবত পান করতে দিলেন। বললেন, 'আমাদের উদ্দেশ্য তোমার বুঝতে হবে যুবক। খৃষ্টানদের সাথে অহেতুক ঝগড়া করা বা খুন খারাবী করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ফিলিস্তিন থেকে খৃস্টানদের বিতাড়িত করা, পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্ত করা এবং সমস্ত আরব অঞ্চল থেকে খৃষ্টানদের বের করে দিয়ে নির্যাতীত মুসলমানদের উদ্ধার করা। এ কাজ করতে হলে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।'

ক্ষিপ্ত কমান্ডারের মাথা তখনও গরম ছিল। সুলতান আইয়ুবী তাকে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

'সৈন্যদের এত আবেগময় হওয়া উচিত নয়।' সুলতান আইয়ুবী সেনাপতি ও কমান্ডারদের বললেন, 'কিন্তু ঈমান আবেগের এই উন্মাদনা দিয়েই দৃঢ় হয়। তবে আবেগকে রাখতে হয় সংযত ও সংহত। তখন তা অপরিসীম শক্তি হিসাবে কাজ করে। আমাদের এই কমান্ডারের আবেগ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছে। ফলে স্বাভাবিক বুদ্ধি বিবেক গুলিয়ে ফেলেছে সে। যদি দ্বীনের শত্রুদের দেখে মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃত জযবা সৃষ্টি হয় তবে ইসলামের পতাকা পৃথিবীর শেষ

সীমানা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।’

ক্ষিপ্ত কমান্ডার হরমনের সঙ্গী যে মেয়েদের ওপর আক্রমণ করেছিল হট্টগোলের মধ্যে তাদের দু’জন পালিয়ে গেলো। রক্ষীদের দৃষ্টির আড়ালে গিয়েও তারা উদ্দেশ্যহীনভাবে ছুটলো কিছুক্ষণ। তারপর এক সময় কমিয়ে দিল চলার গতি। হাঁটতে হাঁটতে তারা সমুদ্র উপকূলে গিয়ে পৌঁছলো। কারণ সমুদ্র ওখান থেকে বেশী দূরে ছিল না।

তারা ভয়ে কাঁপছিল আর নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছিল। সমুদ্র তীরে একটি পরিত্যাক্ত টং দেখে ওরা সেখানেই গিয়ে লুকিয়ে রইলো। শিঘ্রই ওরা দেখতে পেলো এক বিশাল নৌকা কূলে এসে ভিড়ছে। ওরা টংয়ের ভেতর থেকে তাকিয়ে দেখলো নৌকায় মাত্র দু’জন মাল্লা আর একজন আরোহী। পোষাক দেখে মনে হচ্ছে লোকটি নৌবাহিনীর কোন সামরিক অফিসার হবে।

তাদের ধারনা সত্যি ছিল। এ লোক ছিল সুলতান আইয়ুবীর নৌবাহিনীর এক বড় অফিসার। নাম আলফারেস। সুলতান আইয়ুবীর নৌবাহিনী প্রধান ছিলেন এ্যাডমিরাল আবদাল মুহসিন। ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের হাইকমান্ড ছিলেন এ্যাডমিরাল হেশামুদ্দিন লুলু।

সুলতান আইয়ুবীর নৌবাহিনীর হেড কোয়ার্টার ছিল আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে। ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরে হেশামুদ্দিন লুলুর নেতৃত্বে নিয়মিত টহল দিত নৌরক্ষীরা। তাদের মূল কাজ ছিল ইউরোপ থেকে খৃস্টানদের কোন

সামরিক সাহায্য যেন না আসতে পারে তা নিশ্চিত করা।

সুলতান আইয়ুবী হেশামুদ্দিন লুলুকে লোহিত সাগরের দায়িত্ব দেয়ার সময় বলেছিলেন, 'লুল, উপকূল এলাকা যে কোন মূল্যে আমাদের অধিকারে রাখতে হবে। তুমি ছয়টি সামুদ্রিক যুদ্ধজাহাজ প্রস্তুত অবস্থায় উপকূল এলাকায় সব সময় মজুত রাখবে। এগুলোতে তীর ধনুক ছাড়াও মেঞ্জানিক কামান রাখবে যাতে কোন খৃস্টান নৌবহর এলে তাদের সময় মতো বাঁধা দিতে পারে।'

এ্যাডমিরাল হেশামুদ্দিন লুলু প্রখ্যাত নৌকমান্ডার আলফারেসের নেতৃত্বে সঙ্গে সঙ্গে ছয়টি যুদ্ধজাহাজ উপকূল অঞ্চলে পাঠিয়ে দিলেন। একদিন আলফারেস সুলতান আইয়ুবীর খবর পেয়ে জাহাজের বহরটি মাঝ সমুদ্রে রেখে নৌকায় করে উপকূলে নেমে এলেন। উদ্দেশ্য, সুলতান আইয়ুবীর সাথে দেখা করা।

মেয়েরা টংয়ের ভেতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো। সাগর পারে নেমেই আলফারেস দেখতে পেলেন নির্জন সাগর তীরে দাঁড়িয়ে আছে দুই অনিন্দ্য সুন্দরী। তাদের পরণে উপজাতীয় যাযাবর কন্যার পোষাক। তারা আলফারেসের পথের ওপর দাঁড়িয়েছিল।

আলফারেস তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। মেয়ে দুটি তখনো ভীতা হরিণীর মতো কাঁপছিল। তাদের চোখে কাতর অনুনয়।

আলফারেস তাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কে,

এখানে কি করছো?'

মেয়ে দুটি বললো, 'আমারা মরু কন্যা। যাযাবর পল্লীতে থাকি। খৃস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে যে ভীষণ যুদ্ধ হয় সে যুদ্ধের কবলে পড়ে মারা গেছে আমাদের অধিকাংশ পুরুষ ও নারী। যারা বেঁচে যায় তারা এদকি ওদিক পালিয়ে গেছে। কে কোথায় গেছে আমরা কিছুই জানি না। আমরা দু'জন পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আশ্রয় নিয়েছি নির্জন এই সমুদ্র তীরের ওই টংয়ে।'

'এখন তো যুদ্ধ শেষ, এবার ফিরে যাও। নিশ্চয়ই গোত্রের কাউকে না কাউকে পেয়ে যাবে। এখন আর ভয় কি!'

'ভয়!' এক মেয়ে বললো, 'খৃস্টানদের ভয় করি, কারণ তারা আমাদের মনে করে মুসলমান, আর মুসলমানরা আমাদের মনে করে খৃস্টান।'

'আসলে তোমরা কি? তোমরা কি মুসলমান, না খৃস্টান?'

'আমাদের তো কোন ধর্ম নেই। যখন যিনি আমাদের প্রভু হন তার ধর্মই আমাদের ধর্ম।' মেয়েটি বললো, 'আমাদের গোত্রের নিয়ম হচ্ছে, বয়স হলে উপযুক্ত খরিদ্দার দেখে মেয়েদের কারো না কারো কাছে বিক্রি করে দেয়া হয়।'

আলফারেস ছিলেন সুঠাম ও সুন্দর চেহারার অধিকারী এক সেনা কমান্ডার। তারপরও তার চেহারায় খেলা করতো মায়াময় এক কমনীয়তা। চেহারা দেখে বুঝার উপায় ছিল না, এ লোক এমন দুর্দান্ত ও দুঃসাহসী। অসাধারণ বীর যোদ্ধা হিসাবে নৌবাহিনীতে তার খ্যাতি ছিল। কিন্তু লোকজন তাকে বেশী পছন্দ করতো তার অমায়িক হাসি ও কৌতুকপ্রিয়তার জন্য।

তার মুখে সব সময় হাসি লেগেই থাকতো। নারীরা যে সব পুরুষ একবার দেখলে তার চেহারা আর ভুলতে পারে না, আলফারেস ছিলেন তেমনি রমনী মোহন, প্রাণবন্ত ও উচ্ছল। তার এই সদা প্রফুল্ল আনন সহজেই মেয়েদের নজর কেড়ে নিল।

মেয়েরা আলফারেসকে বললো, 'আমরা অসহায়। আপনি কি আমাদের একটু আশ্রয় দেবেন? দরকার হলে আমরা আপনার ওখানে দাসীগিরী করবো।'

তার বয়সী লোকেরা তখন একই সময় দু'তিনটি করে স্ত্রী রাখতো। আভিজাত্য প্রকাশের এটাও একটা পদ্ধতি ছিল। কিন্তু সামরিক বাহিনীর ট্রেনিংয়ের ব্যস্ততা, যুদ্ধের কারণে মাসের পর মাস সাগরে থাকার ফলে অনেকদিন তার স্থলে যাওয়ারই সুযোগ হয়ে উঠেনি। ফলে তখনো আলফারেস বিয়ে করার অবসর করতে পারেননি। আলফারেস ভাবলেন, জাহাজের যারা বড় অফিসার তারা স্ত্রী ও দাসীদের সাথে রাখার জন্য কেবিন পায়। বিয়ে করলে আমিও মাঝে মধ্যে স্ত্রীকে এনে সঙ্গে রাখার সুযোগ পেতাম, কিন্তু আমি তো এখনো বিয়েই করিনি।

মেয়ে দুটির রূপ ও যৌবন দেখে আলফারেস খুবই চমৎকৃত হলেন। গত তিন মাস ধরে তিনি একটানা সমুদ্রে কাটাচ্ছেন। সমুদ্রের একঘেঁয়ে জীবনে তিনি হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। মাটিতে পা দিতে পারায় যখন তার মনটা ভাল হয়ে উঠেছে, তখনই তিনি দেখতে পান মেয়েদের।

আলফারেস মেয়ে দুটিকে বললেন, 'আমার তো মাটির সাথেই সম্পর্ক নেই। নিজেই মাসের পর মাস পড়ে থাকি জাহাজে। তোমরা কি আমার সাথে জাহাজে থাকতে পারবে? যদি তোমরা জাহাজে থাকতে সম্মত হও তবে জাহাজের কোন কামরা তোমাদের জন্য ছেড়ে দেয়া যেতে পারে।'

'আমরা অসহায় ও দুর্বল মেয়ে মানুষ। আপনি আমাদের আশ্রয় দিলে আমরা আপনার ওপর চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকবো। কিন্তু আপনি আমাদের সঙ্গে কোন রকম ধোঁকা ও প্রতারণা করবেন না তো? আমাদের তো বিক্রি করে দেবেন না আবার?'

'আরে না, তোমরা তো আমার ক্রীতদাসী নও।' আলফারেস বললেন, 'তোমরা রাজি থাকলে তোমাদের দু'জনকে আমি মিশর নিয়ে যাবো এবং দু'জনকেই বিয়ে করে নেবো।'

মেয়েরা একে অন্যের দিকে তাকালো। চোখে চোখে কথা বললো। শেষে সিদ্ধান্ত নিয়ে আলফারেসকে বললো, 'আমরা রাজি।'

আলফারেস তার নৌকার মাল্লাদের ডেকে বললেন, 'এদের জাহাজে নিয়ে যাও। আমার ক্যাবিনে ওদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে ফিরে এসে আমার জন্য অপেক্ষা করতে থাকো।' এই বলে আলফারেস মেয়েদেরকে নৌকায় উঠিয়ে দিয়ে আনন্দ মনে গুন গুন করতে করতে সুলতান আইয়ুবীর সাথে দেখা করার জন্য এগিয়ে চললেন।

'আলফারেস!' সুলতান আইয়ুবী তাকে বললেন, 'আমি

তোমার সম্পর্কে জানি। সামুদ্রিক যুদ্ধে তোমার দক্ষতা ও সাফল্যের একাধিক কাহিনীও শুনেছি। কিন্তু বর্তমান অবস্থা অন্য রকম। আগে তুমি ছোটখাট যুদ্ধ করেছো। এখন বিরাট আকারের যুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে।

আমি বায়তুল মোকাদ্দাস জয় করতে এসেছি। কিন্তু তার আগে আমি বড় বড় সামুদ্রিক বন্দরগুলো আমাদের অধিকারে আছে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে চাই। বিশেষ করে উত্তর দক্ষিণ উপকূলের এলাকাগুলো আমার জন্য বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের গোয়েন্দা বাহিনী তোমার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে। এ জন্য তোমার দু'চারটি নৌকা সব সময় কূলে থাকতে হবে। আমি স্থলপথে যেদিকেই যাবো তোমাদের সংবাদ জানাবো। তোমাদের রণতরী সাগরে টহল দিয়ে বেড়াবে। তোমার জাহাজের বহরে অস্ত্র ও খাদ্য শস্যের কোন ঘাটতি নেই তো?'

'আমরা সব দিক থেকে প্রস্তুত হয়েই এসেছি সুলতান।' আলফারেস উত্তর দিলেন।

'বিরাট আকারের যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'খৃস্টানরা হাতিন রণাঙ্গনে যে পরাজয় বরণ করেছে তা কোন তুচ্ছ ব্যাপার নয়। তারা যেভাবে কাপুরুষের মত পালিয়েছে তাতে অপমানের এক বিশাল বোঝা চেপে আছে সমগ্র খৃস্টান জগতের ঘাড়ে। তাদের চারজন সম্রাট এখনো আমার কাছে বন্দী আছে। একজনকে হত্যা করতে আমি বাধ্য হয়েছি। সম্রাট রিমান্ড মারা গেছেন। তাদের সবচে

বাহাদুর ও যোগ্য শাসক সম্রাট বিলডনও মারা গেছেন। ফলে এবার তারা আরো শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে আসবে আমার সাথে মোকাবেলা করার জন্য।

কায়রো থেকে আলী বিন সুফিয়ান সংবাদ পাঠিয়েছেন, ইংল্যান্ড থেকে সম্রাট রিচার্ড ও জার্মানীর সম্রাট ফ্রেডারিক এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ফিলিস্তিন অভিমুখে রওনা হয়ে গেছেন। তারা আসছেন ফিলিস্তিনের মাটিতে ক্রুসেড শাসন টিকিয়ে রাখার জন্য। আমরা লড়ছি এই দখলদার বাহিনীকে ফিলিস্তিনের মাটি থেকে উৎখাত করে মসজিদুল আকসা মুক্ত করার জন্য। তাদের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর সাথে বিশাল নৌবাহিনীও সঙ্গে নিয়ে আসবেন। আর আমি জানি, তাদের রণতরী ও নৌবাহিনী পৃথিবীর সেরা বাহিনী বলে খ্যাত। এই বিশাল বাহিনীকে প্রতিরোধ করতে না পারলে আমরা আমাদের এই বিজয় ধরে রাখতে পারবো না।'

'আপনি কি মনে করেন ওদের সাথে আমাদের এবারের মূল লড়াইটা সমুদ্রেই হবে?' আলফারেস প্রশ্ন করলেন।

'তারা এলে তবে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারবো, তাদের সাথে আমার মূল লড়াইটা কোথায় হবে? আমি কি স্থলপথে ওদের জন্য অপেক্ষা করবো নাকি সমুদ্রপথেই তাদেরকে বাঁধা দিয়ে তাদের অগ্রযাত্রা থামিয়ে দিতে পারবো? ইংল্যান্ডের নৌবাহিনী সম্পর্কে শুনেছি, তাদের নৌবহর বিরাট এবং শক্তিশালী। মনে হচ্ছে তারা সঙ্গে বারুদ নিয়ে আসবে। বারুদ কামানের নলের মধ্যে ভর্তি করবে যাতে আগুন দিলে বারুদ

নলের মধ্য দিয়ে উড়ে এসে জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেয়।'

'আমাদেরও এমন কামান লাভ করার চেষ্টা করা উচিত।'

'ভেবো না, আমরা নিজেরাই ওরকম কামান তৈরী করে নিতে সক্ষম হবো ইনশাআল্লাহ। তোমরা উপকূলের কাছাকাছি কোন শত্রু জাহাজকে ভিড়তে দিও না। ছয়টি জাহাজের যে বহর তোমার কমান্ডে আছে তাকে সংহত রেখে গভীর সাগর পর্যন্ত তুমি টহল দিয়ে বেড়াবে। শত্রু বহরের সন্ধান পেলে তাদের ওপর অতর্কিতে চড়াও হবে। সঙ্গে সঙ্গে সেই খবর যেন আমার কাছে পৌঁছে যায় সেদিকে খেয়াল রাখবে। এ্যাডমিরাল আল মুহসিনকেও প্রস্তুত অবস্থায় উন্মুক্ত সাগরেই অবস্থান করতে বলবে।'

সুলতান আইয়ুবী প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'যাও, সব সময় হুশিয়ার থাকবে এবং বুদ্ধিমত্তা কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে। আর মনে রাখবে, আল্লাহই হচ্ছেন আমাদের প্রকৃত মোহাফেজ। তাই সব সময় আল্লাহর সাহায্য কামনা করতে থাকবে। কখনো এমন কিছু করবে না, যাতে আল্লাহ নারাজ হতে পারেন।'

সুলতানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আলফারেস আর দেরী করলেন না, সঙ্গে সঙ্গে উপকূলের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। নৌকা নির্দিষ্ট স্থানে তার জন্য অপেক্ষা করছিল। তিনি উপকূলে পৌঁছেই মাল্লাদের বললেন, 'জাহাজে চলো!'

নৌকায় কেবলই তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল সুলতানের আদেশ নিষেধ ও পরামর্শগুলো। সুলতানের নির্দেশগুলো যেন

তাকে তাড়িয়ে ফিরছে। তিনি জাহাজে পৌঁছেই অন্য জাহাজের ক্যাপ্টেনদের ডেকে পাঠালেন। তারা এলে তাদের বুঝিয়ে বললেন সুলতানের বর্তমান পরিকল্পনা।

তিনি উপস্থিত ক্যাপ্টেনদের কাছে সুলতানের নির্দেশ ও উপদেশ পৌঁছে দিয়ে বললেন, 'এবার যার যার জাহাজে ফিরে যাও। কঠিন অবস্থা সামনে, তাই সবাইকে সচেতন ও সক্রিয় করে তোল। বিপর্যয় আসার আগেই যারা সতর্ক হতে পারে তারা অনেক বিপদ সহজে মোকাবেলা করতে পারে। কোন রকম অবহেলা ও অলসতাকে মোটেই প্রশ্রয় দেবে না।'

ক্যাপ্টেনরা বিদায় নিয়ে নিজ নিজ জাহাজে ফিরে গেলেন। এতোক্ষণ মেয়েদের কথা আলফারেসের মনেই ছিল না। ক্যাপ্টেনরা বিদায় হতেই তার মনে পড়ে গেল দুটি অসহায় মেয়েকে তিনি জাহাজে পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নিজের ক্যাবিনের দিকে হাঁটা দিলেন।

ক্যাবিনে দুই মেয়ে এতোক্ষণ তার অপেক্ষাতেই বসেছিল। তারা তাকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো এবং আনন্দিত গলায় বললো, 'আপনি এসেছেন?'

'হ্যাঁ, তোমরা ভাল আছো? খাওয়া দাওয়া করেছো?'

তারা সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে সহজভাবেই জিজ্ঞেস করলো, 'এই গভীর সাগরে আপনারা কি করছেন? এই অন্তহীন জলরাশি, সাগরের ঢেউ কি যে ভাল লাগছে!'

আল ফারেসের দীর্ঘদিনের নিরানন্দ জগত যেন হঠাৎ করেই উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। মেয়েদের চোখের তারায় আনন্দ

চিকচিক করছিল, আলফারেসের স্বভাবসুলভ হাসি খুশির সাথে মিশে গেল সেই আনন্দ। পুরুষ পটানোয় পারদর্শী দুই মেয়ের সাথে রং তামাশায় মেতে উঠলেন আলফারেস।

২০ জুলাই ১১৮৭। সুলতান আইয়ুবী আক্রা থেকে বের হলেন। সুলতানের কমাণ্ডো বাহিনী তাঁর জন্য আগে থেকেই রাস্তা পরিষ্কার করে রেখেছিল। তিনি কোন রকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সামনে এগিয়ে গেলেন।

উপকূল এলাকার একাধিক কেল্লা ও বসতি হস্তগত করে তিনি পৌঁছলেন বৈরুতের উপকণ্ঠে। ৩০ জুলাই তিনি বৈরুত অবরোধ করলেন।

খৃষ্টানরা এই গুরুত্বপূর্ণ শহর বাঁচাতে প্রাণপণ লড়াই করলো। কিন্তু সুলতান আইয়ুবীর জানবাজদের সামনে টিকতে পারলো না তারা। অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সাথে তিনি বৈরুত দখল করে নিলেন। দেখলেন, বৈরুতের মুসলমানদের অবস্থাও আক্রার মুসলমানদের মতোই অবর্ণনীয় ও দুর্বিসহ। সীমাহীন নির্যাতনের ছাপ লেগে আছে তাদের চেহারায়। অনেক বস্তি ও ঘরদোর বিধ্বস্ত। মসজিদগুলো বিরাণ। সেগুলোর কোন কোনটি খৃস্টানরা তাদের ঘোড়ার আস্তাবল বানিয়ে নিয়েছে।

২৯ জুলাই বৈরুত শহর পরিপূর্ণভাবে নিজের অধীনে নিয়ে আসার পর তিনি পার্শ্ববর্তী প্রসিদ্ধ উপকূলীয় শহর টায়েরের দিকে যাত্রা করলেন। গোয়েন্দাদের কাছ থেকে খবর পেলেন, খৃস্টানরা এ শহরটির পতন রোধ করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ

করেছে।

তারা তাদের অনেক সৈন্য শহরের বাইরে চারদিকে ছড়িয়ে রেখেছে। এদিক ওদিক থেকে পালিয়ে আসা খৃস্টান সৈন্যরাও সেখানে এসে আশ্রয় নিচ্ছে। তারা নতুন করে সমবেত হচ্ছে সেখানকার বাহিনীতে। বিভিন্ন উপকূল থেকে সরে এসে খৃস্টান সৈন্যরা টায়েরে জমা হচ্ছে আইয়ুবীর সম্ভাব্য হামলা মোকাবেলা করার জন্য।

এ খবর পেয়ে সুলতান আইয়ুবী টায়েরে আক্রমণের পরিকল্পনা ত্যাগ করলেন। তিনি টায়েরে নতুন করে শক্তি ক্ষয় না করে বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণের জন্য সৈন্য বাহিনী দৃঢ় করতে লাগলেন।

আলফারেসের যুদ্ধজাহাজগুলো তখনো সাগরে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। মেয়েরা জাহাজেই স্বচ্ছন্দে অবস্থান করছে। তারা এরই মধ্যে আলফারেসের হৃদয়-মন জয় করে নিয়েছে। স্ফুর্তিবাজ লোক হওয়ার পরও আলফারেস ছিলেন যথেষ্ট দায়িত্ব সচেতন ব্যক্তি। তিনি তার দায়িত্বে বিন্দুমাত্র ত্রুটি বা শৈথিল্য প্রদর্শন করেননি। প্রতিটি জাহাজের সাথে সংযোগ রক্ষা করে তিনি সমুদ্রে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

যখন কোন জাহাজ উপকূলের কাছে যেতো তখন আশপাশের ছোট ছোট নৌকা এসে ভীড়তো জাহাজের পাশে। এসব নৌকায় করে গরীব ফেরিওয়ালারা ফল, ডিম, মাখন ইত্যাদি নিয়ে বিক্রি করতো জাহাজীদের কাছে। নৌ সেনারা রশির সিঁড়ি ফেলে তাদের কাউকে কাউকে উঠিয়ে নিত

জাহাজে। প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র কেনাকাটা করে আবার তাদের নামিয়ে দিত। এই ফেরিওয়ালাদের মধ্যেই থাকতো খৃস্টান ও মুসলিম গোয়েন্দারা। জাহাজের ক্যাপ্টেন এটা ওটা কেনার উসিলায় গোয়েন্দাদের কখনো কখনো তুলে নিতেন উপরে। খবরাখবর জেনে নিয়ে আবার তাদের নিচে নামিয়ে দিতেন।

একদিন আলফারেস জাহাজ নিয়ে কূলে গেলেন। গোয়েন্দাদের কাছ থেকে সর্বশেষ সংবাদ নেয়াই ছিল তার উদ্দেশ্য। তিনি ফেরিওয়ালাবেশী মুসলিম গোয়েন্দাকে উপরে তুলে নিলেন।

মেয়ে দু'জন জাহাজের কার্নিশ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। ছোট ছোট তিন চারটি নৌকা এসে ভিড়লো জাহাজের সাথে। নৌকাগুলোতে ফল, ডিম, মাখন ও নানান খাদ্য দ্রব্য। নৌকার ফেরিওয়ালারা জাহাজের লোকদের অনুরোধ করছিল কিছু কেনার জন্য। হাকডাক করে বলছিল তাদের কাছে কি কি আছে।

এক নৌকায় মধ্য বয়সী এক লোক ছেঁড়া কাপড় পরে নৌকার হাল ধরে বসেছিল। লোকটাকে খুবই নিরীহ ও গরীব বলে মনে হচ্ছিল। মেয়েরা কার্নিশে দাঁড়িয়েই দেখলো নৌকাটি তাদের দিকে এগিয়ে আসছে। কাছে এসে লোকটি হাক ছাড়লো, 'কিছু কিনবেন নাকি শাহজাদীরা? আমি খুবই গরীব। দয়া করে আমার কাছ থেকে কিছু কিনুন।'

মেয়েরা লোকটির দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল, হঠাৎ তাদের মনে হলো লোকটি তাদের দিকে চোখ টিপে কিছু

ইঙ্গিত করছে। মেয়েরা আশ্চর্য হয়ে একে অন্যের দিকে তাকালো। তারপর আবার যখন ওরা তার দিকে ফিরলো, সেই লোক বুকের উপর আঙ্গুল দিয়ে ইশারায় ক্রুশ চিহ্ন আঁকলো। এক মেয়ে তার দুই হাতের তর্জনীর আঙ্গুল আড়াআড়ি ভাবে রেখে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে এর জবাব দিল। মেয়েরা ওর ইঙ্গিত ধরতে পেরেছে দেখে লোকটির ঠোঁটে ফুটে উঠলো বিজয়ের হাসি। মেয়েরা রশির মই নামিয়ে লোকটিকে জাহাজে উঠে আসতে বললো।

মাল্লারা জানতো, এই মেয়েরা জাহাজের ক্যাপ্টেনের আশ্রিতা। মাল্লারা মেয়েদের হুকুম পেয়ে জলদি রশির সিঁড়ি ফেলে দিল। লোকটি তার ঝুড়িতে বিভিন্ন খাবার জিনিষ নিয়ে জাহাজে উঠে এলো। মেয়েরা তাকে একদিকে সরিয়ে নিয়ে তার জিনিষ দেখতে লাগলো। মেয়েরা বিরক্ত হতে পারে ভেবে জাহাজের পুরুষ সৈনিক বা মাল্লাদের কেউ ওদের কাছে যাওয়ার কথা ভাবলো না।

'তোমরা এখানে কেমন করে পৌছলে?' লোকটি নিচু স্বরে তাদের জিজ্ঞেস করলো।

'সে এক দৈব ঘটনা।' এক মেয়ে বললো, 'সম্রাট হরমন ধরা পড়েছেন। আমাদের কয়েকজন মারা গেছে মুসলমানদের হাতে। আমরা পালিয়ে সমুদ্র পাড়ে পৌছতে সক্ষম হয়েছিলাম। তারপর এই জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাথে জাহাজে এসে উঠেছি।'

'আরো খুলে বলো। এই জাহাজের ক্যাপ্টেনের সাথে

তোমাদের কি করে পরিচয় হলো?'

মেয়েটি সমস্ত ঘটনা লোকটিকে খুলে বললো। ক্যাপ্টেন আলফারেস সম্পর্কে বললো, 'আমরা তার কাছে নিজেদের অসহায় যাযাবর কন্যা বলে পরিচয় দিয়েছি। তিনি আমাদের বিশ্বাস করে সঙ্গে নিয়ে এসে আশ্রয় দিয়েছেন।'

'কোন চিন্তা করেছো, এখন কি করবে?' লোকটি জিজ্ঞেস করলো, 'কোথায় যাবে?'

'জীবন বাঁচানোর দরকার ছিল, আগে তার ব্যবস্থা করেছি।' মেয়েটি বললো, 'এখন ক্যাপ্টেন আলফারেসের রগ পর্যন্ত আমরা নিয়ন্ত্রণ করছি। সুযোগ পেলে আমরা পালানোর চেষ্টা করবো। আর তুমি যদি মনে করো এখানে থেকেই কিছু করতে পারবো তবে সে ভাবেও আমাদের কাজে লাগাতে পারো।'

এই লোকটি ছিল খৃষ্টানদের গোয়েন্দা। সে মেয়েদেরকে আগে থেকেই চিনতো, মেয়েরাও চিনতো তাকে। মেয়েদের দেখেই সে তাদের চিনে ফেলেছিল, কিন্তু ছদ্মবেশে থাকায় মেয়েরা প্রথমে তাকে চিনতে পারেনি। জাহাজে উঠে আসার পর তার কণ্ঠ শুনে চিনতে পারে এ লোক তাদেরই এক গোয়েন্দা কমান্ডার।

সে লোক মেয়েদের বললো, 'উপকূলে নেমে পালানোর চেষ্টা করো না। তাতে কঠিন বিপদের সম্মুখীন হবে। বৈরুত পর্যন্ত মুসলমানদের অধিকারে চলে গেছে। আমাদের খৃষ্টান বাহিনী সবখানেই পিছু হটছে। এখন উপকূলে নামলে

মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করা হবে। শুধুমাত্র টায়ের শহর অবশিষ্ট আছে যেখানে এখনো তোমাদের আশ্রয় মিলতে পারে।'

'তাহলে এখন তুমি আমাদের কি করতে বলো।' জানতে চাইলো এক মেয়ে।

'এখন এই জাহাজেই থাকো। আমি তোমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবো। আমাদের জন্য পরিস্থিতি এখন খুবই সংকটজনক। সবখানেই মুসলিম বাহিনী অস্ত্র হাতে ঘুরছে। অতএব যা করার খুব সাবধানে করতে হবে।'

'তুমি এখানে কি করছো?'

'আমি ক্রুশের ওপর হাত রেখে যে শপথ করেছিলাম তাই পালন করছি।' সে উত্তরে বললো, 'এই জাহাজগুলোর গতিবিধি লক্ষ্য করছি। এগুলো ধ্বংস করার একটা ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করবো।'

'আমাদের জাহাজ কোথায় আছে?'

'টায়েরের কাছে।' সে বললো, 'এ জাহাজ যদি সেদিকে যায়, তবে আমি আগেই সংবাদ জানিয়ে দেবো। তোমরা দৈবক্রমে শত্রুর জাহাজে আশ্রয় পাওয়ায় ভালই হয়েছে। এখন আমি নতুন করে পরিকল্পনা করতে পারবো। তোমরাও আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারবে। আর যদি তোমাদের এই জাহাজ থেকে বের করে টায়েরে পৌঁছানো দরকার হয় আমি তারও ব্যবস্থা করবো।

অনেক্ষণ হয়ে গেল, এবার আমার কেটে পড়া দরকার। সব সময় দেখা করা সম্ভব নাও হতে পারে। ইশারায় সব কিছু

বুঝে নিতে চেষ্টা করবে। আমি এই জাহাজগুলোর সাথে ছায়ার মত লেগে আছি। এ জাহাজগুলো উপকূলের কোথাও না কোথাও নোঙ্গর করবেই। তখন আমি এই বেশেই তোমাদের সাথে দেখা করবো।'

সে ওদের কিছু সংকেত বুঝিয়ে দিল। মেয়েরা তার ঝুড়ি থেকে কিছু জিনিষ কিনে বিদায় করে দিল তাকে। লোকটি রশির সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল তার ছোট ডিঙ্গিতে।

১১৮৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর। সুলতান আইয়ুবী উপকূলীয় শহর আসকালান অবরোধ করলেন। এখানেও খৃস্টানরা প্রতিরোধ গড়ে তুলল। সুলতান আইয়ুবী মেঞ্জানিক কামান দিয়ে ভারী পাথর নিক্ষেপ করা শুরু করলেন শহরের ওপর। এই মেঞ্জানিক ব্যবহারে এবার একটি বাড়তি সুবিধা পাচ্ছিলেন সুলতান। এতদিন মেঞ্জানিকগুলো বহন করা ছিল খুবই সমস্যাবহুল। এবার প্রতিটি মেঞ্জানিকের নিচে চাকা লাগানো ছিল। ফলে এখানে ওখানে সরিয়ে সুবিধামত তিনি মেঞ্জানিকগুলো ব্যবহার করতে পারছিলেন।

রাতে মেঞ্জানিকের ছত্রছায়ায় দেয়াল ভাঙ্গার জন্য বিশেষভাবে তৈরী বাহিনীকে পাঠিয়ে দেয়া হলো প্রাচীরের কাছে। সারা রাত সুড়ং তৈরীর বাহিনী প্রাচীর খোদাই করে প্রাচীরের ভেতর বড় রকমের সুড়ং তৈরী করে ফেললো। পাশেই এক উঁচু স্থান থেকে শহরের মধ্যে মেঞ্জানিক দিয়ে অব্যাহতভাবে পাথর ও অগ্নি নিক্ষেপ চলছিল। পর দিন ভোরে দেয়ালে ফাটল দেখেই শহরবাসী গেট খুলে দিয়ে আত্মসমর্পন

করলো।

এই শহরটা ১১৫৩ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর ফ্রাংকস বাহিনী অধিকার করে নিয়েছিল। পূর্ণ চৌত্রিশ বছর পর শহরটি আবার দখল মুক্ত হলো।

আসকালান থেকে বায়তুল মোকাদ্দাসের দূরত্ব মাত্র চল্লিশ মাইল। শহরটি ছিল আসকালান থেকে সোজা পূর্ব দিকে। বায়তুল মোকাদ্দাসের নিকটতম শহর হিসাবে কৌশলগত দিক থেকে আসকালান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীর জন্য এই দূরত্ব অতিক্রম করা ছিল মাত্র দু'দিনের ব্যাপার।

সুলতান আইয়ুবী আসকালানের প্রাচীরের ওপর দাঁড়িয়ে পূর্ব দিকে তাকিয়েছিলেন। মরুভূমির বিশাল শূন্যতা অতিক্রম করে তাঁর অন্তর দৃষ্টি চলে গিয়েছিল জেরুজালেম। তিনি যেন এখানে দাঁড়িয়েও দেখতে পাচ্ছেন বায়তুল মোকাদ্দাস মসজিদের সুউচ্চ মিনার চূড়া ।

সুলতান আইয়ুবী তাঁর কমাণ্ডো বাহিনীকে এগিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেন। বললেন, 'আসকালান থেকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত এই চল্লিশ মাইল পথকে চারটি ভাগে ভাগ করে নাও। একেক ভাগের নিয়ন্ত্রণ নাও একেক গ্রুপ। পথে যে সব সেনা ছাউনি ও খৃষ্টানদের ফাঁড়ি পাবে সেগুলো ধ্বংস করে দেবে। তোমাদের অগ্রযাত্রা দেখেছে এমন কাউকে তোমাদের অতিক্রম করে সামনে যেতে দেবে না। সে লোক বেসামরিক ব্যক্তি হলেও। আমাদের মূল বাহিনীর পথ নিষ্কন্টক রাখা

তোমাদের দায়িত্ব। জেরুজালেম পর্যন্ত পথের প্রতিটি মঞ্জিলের অগ্রযাত্রার খবর আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবে।'

আসকালান দখল হওয়ার পর আসকালান থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত যত খৃস্টান গ্রাম ও বস্তি ছিল সেখানকার নারী, পুরুষ ও শিশুরা দলে দলে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে ছুটলো জেরুজালেম। আইয়ুবী ভীতি গ্রাস করে নিয়েছিল সমগ্র জনপদ। খৃস্টানরা বেশী শঙ্কিত ছিল নিজেদের অপকর্মের কারণে। কারণ এতদিন মুসলমানদের ওপর তারা যে নির্মম অত্যাচার করেছে স্বাভাবিকভাবেই তারা আশঙ্কা করছিল, এবার মুসলমানরা তার প্রতিশোধ নেবে। এই প্রতিশোধের হাত থেকে বাঁচার জন্যই তারা দলে দলে ছুটছিল জেরুজালেম।

সুলতান আইয়ুবী বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানরত তাঁর সমগ্র বাহিনীকে আসকালান ঘাঁটিতে সমবেত হওয়ার আদেশ দিলেন। শুরু হলো বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধারের চূড়ান্ত আক্রমণ করার প্রস্তুতি।

সুলতান আইয়ুবীর এই বিজয় ও অগ্রাভিযানের খবর দামেশক, বাগদাদ, হলব, মুশেল ও কায়রোসহ সমস্ত আরব বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা সর্বশেষ সংবাদ পেলো, সুলতান আইয়ুবী এখন আসকালানে আছেন। শিঘ্রই তিনি জেরুজালেম আক্রমণ করবেন।

ইতিহাসবিদ কাজী বাহাউদ্দিন শাদ্দাদ লিখেছেন, 'মনে করা হচ্ছিল, ক্রমাগত যুদ্ধের ফলে আইয়ুবীর সৈন্যরা ক্লান্ত ও নির্জীব অবস্থায় এসে আসাকালান পৌঁছবে। তাদের বাহুগুলো থাকবে

অবসাদগ্রস্ত আর চেহারায় থাকবে সাময়িক বিশ্রামের করুণ আকুতি।

কিন্তু সুলতান আইয়ুবীর সৈন্যরা যখন আসকালান এসে জমায়েত হতে শুরু করলো তখন দেখা গেল, ক্রমাগত সাফল্যে তাদের চেহারাগুলোতে বিশ্বাসের দৃঢ়তা আরো মজবুত হয়েছে। এই সব সৈনিকরা যেখানেই গেছে সেখানেই দেখেছে সাধারণ মুসলমানদের ওপর খৃষ্টানদের বর্বর নির্যাতনের চাক্ষুস দৃশ্য। ফলে তাদের মনে এর ভয়াবহ ছাপ পড়েছে। এই নির্যাতনের মূল উপড়ে ফেলার জন্য মনে মনে তারা নতুন করে শপথ নিয়েছে। শপথের দৃঢ়তায় শানিত হয়েছে তাদের চেতনার রঙ। এসব দৃশ্য তারা যতো দেখেছে ততোই অন্তরে জ্বলে উঠেছে প্রতিশোধের আগুন। আসকালানে আসা প্রতিটি সৈনিকের চোখে মুখে তাই খেলা করছিল টগবগে উদ্যম। তারা বায়তুল মোকাদ্দাসে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ছিল অধীর ও অস্থির। এই আবেগই ছিল জেরুজালেম উদ্ধারে সুলতান আইয়ুবীর প্রধান অস্ত্র।

আসকালানে থাকা অবস্থায় আরেকটি ঘটনায় সুলতান আইয়ুবীর মনোবল আরো বেড়ে যায়। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল, বিশেষ করে দামেশক, বাগদাদ ও অন্যান্য শহর থেকে সেই সময়কার শ্রেষ্ঠ আলেম ওলামারা দল বেঁধে দূর দূরান্তের পথ অতিক্রম করে সুলতানের সাথে দেখা করে সুলতানের সাথে জেরুজালেম প্রবেশ করার আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন।

আলেম সমাজের এই আগ্রহ ও দোয়াকে তিনি খুবই ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করলেন। তাঁরা সৈন্যদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য সেনাবাহিনীর সদস্যদের কাছে বায়তুল মোকাদ্দাস প্রবেশের গুরুত্ব ও তার পবিত্রতা বর্ণনা করে ভাষণ দিলেন। বুজুর্গানে দ্বীনের ভাষণ শুনে সেনা বাহিনীর সদস্যদের জযবা ও আকাংখার আগুন আরও তীব্রতর হয়ে উঠলো।

সুলতান আইয়ুবী আলেম সমাজ, সুফি দরবেশ ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে খুবই সম্মান করতেন। তাদের সাথে পেয়ে তিনি দ্বিগুণ উৎসাহ বোধ করেন। তিনিও তাঁর ক্লান্তি ভুলে গভীর আবেগে বললেন, 'আপনারা দোয়া করুন। ইনশাল্লাহ দুনিয়ার কোন শক্তিই এবার আমাদের পথ আটকাতে পারবে না।'

এ সময় আরো একটি বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলো। সুলতান আইয়ুবী আসকালানে আলেমদের সাথে আলাপ করছিলেন, এ সময় তাকে খবর দেয়া হলো, 'হলব থেকে এক মেহমান এসেছেন।'

সুলতান আইয়ুবী তাকে ভেতরে পাঠিয়ে দেয়ার জন্য বললে খবরদাতা সুলতানের কানের কাছে মুখ নিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে কিছু বললো। সাথে সাথে সুলতান উঠে দাঁড়ালেন এবং বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, 'তুমি ঠিক বলছো?'

'হ্যাঁ সুলতান।'

সুলতান আইয়ুবী মেহমানদের রেখে একাই বাইরে এলেন। বাইরের দৃশ্য দেখে তিনি নিজের চোখকেই যেনো বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এই মেহমান ছিলেন মরহুম

নুরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী রাজিয়া খাতুন, যিনি পরবর্তীতে ইয়াজউদ্দিনের বিবি হয়েছিলেন।

রাজিয়া খাতুন তখনো অশ্বপৃষ্ঠে বসা। সুলতানকে দেখেই তিনি অশ্বপৃষ্ঠ থেকে লাফিয়ে নামলেন। সুলতানও ছুটে গেলেন তার কাছে। আবেগে অনেকক্ষণ দু'জনের কেউ কথা বলতে পারলেন না।

কিছুক্ষণ পর। তারা সবেমাত্র কুশল বিনিময় শেষ করেছেন। একটি উটের কাফেলা এসে তাদের কাছাকাছি থামলো। উটের ওপর দু'শর অধিক আরোহী, সবাই মেয়ে।

'এসব কি?' সুলতান আইয়ুবী রাজিয়া খাতুনকে জিজ্ঞেস করলেন।

'আহত সৈন্যদের সেবা করার জন্য আমি ওদের নিয়ে এসেছি।' রাজিয়া খাতুন উত্তর দিলেন, 'আমি ওদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছি। ওরা শুধু নার্স নয়, যুদ্ধ বিদ্যায়ও সমান পারদর্শী। আপনি ওদের তীরন্দাজীতে যেমন পটু পাবেন তেমনি তলোয়ার চালনায়ও ওরা দক্ষ।' রাজিয়া খাতুন একটু দম নিয়ে বললেন, 'ভাই, আমি জানি তুমি যুদ্ধের ময়দানে মেয়েদের আনা পছন্দ করো না। কিন্তু আমার এই মেয়েদের আবেগকে তুমি বাঁধা দিও না। তুমি জানো না, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এসব মেয়েরা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য আবেগে ফেটে পড়ছে। ওরা রণক্ষেত্রে যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে।'

হতবিহবল সুলতান নির্বাক দাঁড়িয়েছিলেন। সুলতান কিছুই বলছেন না দেখে তিনি আরেকটু সাহসী হলেন। বললেন, 'যদি

তুমি আমাকে অনুমতি দাও তবে আরও এক হাজার যোদ্ধা মেয়ে আমি এখনি যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাতে পারবো। পুরুষ সৈন্যদের মতোই ওরা সমান দক্ষতা নিয়ে যুদ্ধ করবে। ওদের লড়াই দেখে ওরা পুরুষ না মেয়ে সে পার্থক্য তুমিও করতে পারবে না।

পুরুষ আর মেয়ে বলো, ওরা তো একই মায়ের দুধ পান করেছে, ওদের চেতনাও অভিন্ন। যে মায়েরা তার ছেলেকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠিয়ে বিজয়ের খবর শুনতে চায়, সন্তান ফেরত চায় না, ওরাও সেই মায়ের সন্তান। আজ আর নারী পুরুষ নেই, সবার মুখে এক কথা, যুদ্ধক্ষেত্রের খবর কি? বলো, ভাই সালাহউদ্দিন, আমি কি ওই মেয়েদের লড়াই করার জন্য পাঠাবো?'

'আমি এদেরকে আহত সৈন্যদের সেবার জন্য রেখে দেবো।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'তবে আমি কোন মেয়েকে যুদ্ধের ময়দানে পাঠাবো না।'

'সুলতান!' রাজিয়া খাতুন আইয়ুবীকে বললেন, 'এই উটের পিঠে তোমার জন্য এক দামী উপহার নিয়ে এসেছি। এমন দামী উপহার...।' এটুকু বলেই রাজিয়া খাতুন ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললেন।

সুলতান বিচলিত হয়ে বললেন, 'কি এনেছেন? কি আছে উটের পিঠে?'

রাজিয়া খাতুন চোখ মুছে বললেন, 'হয়তো তোমার মনে আছে, আমার মরহুম স্বামী একটি মিম্বর তৈরী করে

রেখেছিলেন, তিনি যখন বায়তুল মোকাদ্দাস শত্রু মুক্ত করবেন তখন তা মসজিদুল আকসায় স্থাপন করবেন। তার ইচ্ছে ছিল, এই মিম্বরে দাঁড়িয়ে তিনি সমবেত মুসল্লিদের সামনে খোৎবা দেবেন। মিম্বরটি খুবই সুন্দর। এটি এতোদিন দামেশকে রাখা ছিল। আমি সেখান থেকে ওটা তোমার জন্য নিয়ে এসেছি। আমি জানি, আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই বিজয় দান করবেন। ভাই সালাহউদ্দিন, আমার ইচ্ছা, এই মিম্বরের ওপর দাঁড়িয়ে তুমি মসজিদুল আকসায় খোৎবা দাও। আমার নেকবখত স্বামীর আশা তুমি পূরণ করো।'

এ কথা শোনার পর সুলতান আইয়ুবী তার নিজের অশ্রুও আর সম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে এই বলে দোয়া করলেন, 'হে আল্লাহ, তুমি এই মহিয়সী নারীর আশা পূরণ করো। সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর স্বপ্ন পূরণ করো। এই মিম্বর মসজিদুল আকসায় স্থাপন করার তৌফিক দাও আমাকে।'

শাহজাদীর মতো এক যুবতী কন্যা উটের পিঠ থেকে নেমে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালো। হেসে সুলতান আইয়ুবীকে সালাম দিয়ে বললো, 'আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

রাজিয়া খাতুন মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সালাহউদ্দিন, এ আমার মেয়ে শাহজাদী শামসুন্নেছা!'

সুলতান আইয়ুবীর চোখ আবারও বাষ্পরুদ্ধ হয়ে উঠলো। তিনি বললেন, 'এই মেয়েকে আমি দেখেছিলাম যখন সে খুব ছোট, একেবারে অবুঝ বালিকা।'

'এই মেয়েই মেয়েদের কমান্ড করবে।' রাজিয়া খাতুন বললেন, 'এখন আমাকে বিদায় দাও, আমাকে জলদি ফিরে যেতে হবে।'

সেই সম্মানিত আলেম, যারা সুলতান আইয়ুবীর নিকটে এসেছিলেন, তাঁরা সবাই দোয়া করছিলেন মুজাহিদদের বিজয়ের জন্য। মাঝে মাঝে সৈন্যদের কাছে গিয়ে তাদের সামনে তুলে ধরছিলেন জিহাদের গুরুত্ব। সৈন্যরা তাদের এই বয়ান শুনে আরো উজ্জীবিত হয়ে উঠছিল।

তারা আসেকালানের বিভিন্ন সামরিক ক্যাম্পে গিয়ে বক্তৃতা করতেন। বলতেন, 'হে আল্লাহর সিপাহীগণ! কাফেররা তোমাদের প্রথম কেবলা নব্বই বছর ধরে অধিকার করে রেখেছে। আল্লাহ সেই মসজিদ দুশমনের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য তোমাদের বাছাই করেছেন। ভেবে দেখো, এটা তোমাদের জন্য কত বড় সৌভাগ্য!

কোরআনের নির্দেশ যদি তোমরা পড়ে থাকো তবে মসজিদুল আকসা কাফেরদের কবল থেকে মুক্ত না করে তোমাদের বিশ্রাম করার কোন সুযোগ নেই। এই সে মসজিদুল আকসা, যেখান থেকে আমাদের প্রিয় নবী মে'রাজে গিয়েছিলেন। এখন সে মসজিদ কাফেরদের গির্জায় পরিণত হয়ে গেছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) এর পবিত্র আত্মা আমাদের উপর অভিশাপ দিচ্ছে। এমন অবস্থায় আমাদের পানাহার, বিশ্রাম এমনকি বিবির সংস্পর্শও নিষেধ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু

আমরা নব্বই বছর শুধু ঘুমিয়েই কাটিয়েছি। আমরা দায়িত্বের কথা ভুলে ভোগ বিলাসে সময় নষ্ট করেছি।

হে, আল্লাহর সৈনিকরা! আমাদের শাসক শ্রেণী ইহুদী ও খৃষ্টানদের পাতানো জালে আটকে নিজেদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ করে নিজেরাই ধ্বংস হয়েছে। অথচ আমরা তাদের ক্ষমতায় বসিয়েছিলাম এই আশায় যে, তারা আমাদের জানমালের নিরাপত্তা দান করবে। আমরা ভেবেছিলাম, তারা আমাদের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখবে এবং আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়া ভূমি পূনরুদ্ধার করবে। তারা আমাদের প্রথম কেবলা পবিত্র মসজিদ বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্ত করবে।

মুজাহিদ ভাইয়েরা! যেখানে আমাদের প্রিয় নবীর পবিত্র পদচিহ্ন পড়েছিল, যে পবিত্র মসজিদে তাঁর কপাল সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিল, সেখানে নাপাক পা নিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে ইহুদী ও খৃস্টানরা। হযরত ইবরাহিম (আ.), হযরত সুলায়মান (আ.), হযরত উমর (রা.) এমনি কত শত নবী, সাহাবীর পবিত্র স্পর্শে যে মাটি ধন্য হয়েছিল, সেখানে এখন বিচরণ করছে কাফের নাসারারা। দীর্ঘ নব্বই বছর ধরে সেখানে সিজদা দেয়ার সুযোগ বঞ্চিত মুসলমানরা।

এর কারণ আর কিছুই নয়, কারণ আমরা নিজেরা। আমরা ছিলাম গাফেল। আমরা ছিলাম চেতনাহীন। তাই আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে রক্তের বন্যা। আমরা ইজ্জত দিয়েছি, ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। এই কঠিন অভিশাপ থেকে বাঁচতে হলে কঠিন শপথ নিয়েই ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তোমাদের।

আমাদের মা-বোনরা তোমাদের জন্য দোয়া করছে। তাদের চোখের পানি নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আজ সমগ্র জাতি তাকিয়ে আছে তোমাদের দিকে। তোমাদের ওপর কঠিন দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে তারা আশা করছে, তোমরা তাদের জীবনে নিয়ে আসবে নয়া প্রভাত। তাদের হতাশ জীবনে আশার আলো জ্বালবে তোমাদের কুওত ও হিম্মত।

হে মানবতার রক্ষক সিংহ শার্দুলেরা! তোমরা যখন জেরুজালেম পৌঁছবে তখন তোমরা নিজের চোখেই দেখতে পাবে সে শহরের করুণ পরিণতি। তোমরা দেখতে পাবে, মসজিদুল আকসার ভেতর ক্রুশ চিহ্ন ও মূর্তির ছড়াছড়ি। কোন কোন মসজিদকে দেখতে পাবে খৃস্টানদের ঘোড়ার আস্তাবল।

এই শহর দখল করার সময় খৃস্টানরা মুসলমানদের এমনভাবে হত্যা করেছিল যে, মুসলমানদের রক্তে শহরের অলিগলি রাজপথ ভেসে গিয়েছিল। যারা বেঁচে ছিল, আজ নব্বই বছর যাবত সেই সব মুসলমানরা সেখানে বন্দী জীবন যাপন করছে। তোমাদের বোনেরা সেখানে কাফেরদের দাসী বাদী হয়ে জীবন কাটাচ্ছে।

হে রাসূলের প্রেমিকরা! হে আমার মুজাহিদ ভাইয়েরা! আল্লাহ তোমাদের এমন সুযোগ দান করেছেন যে সুযোগ বিগত নব্বই বছর এ জাতির সন্তানরা পায়নি। তাই বলছি, হিম্মতে বুক বাঁধো। বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্ত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ো দুর্বার বেগে। ইনশাআল্লাহ, ব্যর্থতা এবার তোমাদেরকে স্পর্শও করতে পারবে না।

মনে রেখো, আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়া মুসাফিরের জীবনে ব্যর্থতা বলে কিছু নেই। তোমরা বিজয়ী হলে হবে গাজী। আর যদি তোমাদের ভাগ্যে শাহাদাত লেখা থাকে তবে মনে রেখো, তোমাদের জীবন ষোলকলায় পূর্ণ হলো। আল্লাহ নিজে বলেছেন, 'আর যারা আমার পথে নিহত হয় তোমরা তাদের মৃত বলো না, বরং তারা জীবিত। যদিও তোমরা তা বুঝতে পারো না।' এই সব শহীদের আত্মাগুলো চলে যায় জান্নাতের বাগানে।

তোমরা শুনে বিস্মিত হবে, বায়তুল মোকাদ্দাস দখল করার সময়ই যে মুসলমানদের ওপর নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালানো হয়েছে এমন নয়। আফসোস! হযরত ইসা (আ.) মানব জাতিকে প্রেম ও ভালবাসার শিক্ষা দান করেছিলেন। আজ তার অনুসারী বলে দাবীদার ক্রুশের পুজারীরা এমন পশুত্ব ও বর্বরতা চালাচ্ছে, যার কোন তুলনা হয় না।

এই বর্বরতা তারা দেখাচ্ছে যুগের পর যুগ। যখনি কোথাও তারা বিজয় লাভে সমর্থ হয় তখনি জেরুজালেমের নিরীহ মুসলমানদের ওপর নেমে আসে সীমাহীন জুলুম। বিজয়ী খৃস্টানরা জেরুজালেমে আয়োজন করে আনন্দ উৎসব। সেই উৎসবে আমাদের যুবতী মেয়েদেরকে তারা উলঙ্গ হয়ে নাচতে বাধ্য করে।

এখানেই শেষ নয়। তাদের মর্মান্তিক ও অমানবিক আচরণের কথা শুনলেও গা শিউরে উঠে। উৎসবের সবচে প্রিয় অনুষ্ঠান তাদের মানুষের গোশত খাওয়া। উৎসব উপলক্ষে তারা

কয়েকজন মোটা তাজা যুবক মুসলমানকে ধরে আনে। তারপর তাকে জবাই করে তার গোশত রান্না করা হয়। এই গোশতের স্বাদের নাকি কোন তুলনা হয় না।

প্রিয় বন্ধুরা! সভ্যতা ও মানবতার এ অপমান আমরা আর কতকাল সইবো? আর কত নিরীহ মুসলমানকে তাদের পাশবিক লালসার শিকার হতে দেবো আমরা? মনে রেখো, ইহুদী ও খৃস্টানরা সাপের মতোই কোমল আর হিংস্র। বিষদাঁত না ভাঙ্গা পর্যন্ত তারা এভাবেই আমাদের শিরায় শিরায় ছোবল হানতে থাকবে।

জানি না তোমাদের শুনতে কেমন লাগবে। তবে শুনে রাখো, মরহুম সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গীর বিধবা স্ত্রী রাজিয়া খাতুন দামেশক থেকে একটি সুদৃশ্য মিম্বর নিয়ে এসেছেন মসজিদুল আকসায় স্থাপনের জন্য। এই মিম্বরটি মরহুম জঙ্গী মরার আগে এ মসজিদে স্থাপন করার জন্যই তৈরী করেছিলেন।

সেই মহিয়সী মহিলা সঙ্গে করে দুশো মেয়ে যোদ্ধা নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এখানে এসেছেন। তিনি সুলতান আইয়ুবীর কাছে আরো এক হাজার মেয়ে যোদ্ধা ময়দানে হাজির করার অনুমতি চেয়েছেন। যদি প্রয়োজন হয় আরো হাজার হাজার নারীকে তিনি যুদ্ধের মাঠে নিয়ে আসতে পারবেন বলে জানিয়েছেন সুলতানকে।

তার স্পষ্ট বক্তব্য, মসজিদুল আকসা মুক্ত না করা পর্যন্ত এই সব নারীরা ঘরে ফিরবে না। তারা আইয়ুবীকে বলেছে, ‘যে মায়ের দুধ পান করে আপনার সৈন্যরা ময়দানে এসেছে সেই

একই মায়ের দুধ পান করেছি আমরাও। বহু যুদ্ধ করে হয়তো পুরুষদের বাহুগুলো শিথিল হয়ে যেতে পারে, আপনি আমাদের সুযোগ দিয়ে দেখুন, আমাদের একটি বাহুও শিথিল পাবেন না।'

এই নারী বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর আদরের কন্যা শামসুন্নেছা। আমি তোমাদের কাছে জানতে চাই, তারা যে বলেছে, যুদ্ধ করে করে তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছো, এটাই ঠিক, নাকি এখনো লড়াই করার হিম্মত রাখো তোমরা? তোমরা কি শাহজাদী শামসুন্নেছাকে ময়দানে পাঠিয়ে বিশ্রাম নিতে চাও, নাকি বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্ত করে সেই মসজিদে শোকরানা নামাজ পড়ার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে চাও শামসুন্নেছাকে?'

এরপর আর বক্তব্য রাখার সুযোগ পেতেন না সম্মানিত আলেমবৃন্দ। হাজারো যোদ্ধার গগনবিদারী তাকবীর ধ্বনির আড়ালে হারিয়ে যেতো তাদের তাতানো কণ্ঠগুলো।

সুলতান আইয়ুবী তার বাহিনী একত্রিত করে তাদের সুশৃঙ্খলভাবে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিচ্ছিলেন। গোয়েন্দাদের রিপোর্ট অনুসারে নতুন করে সাজাচ্ছিলেন সেনাবাহিনী। এভাবেই বায়তুল মোকাদ্দাস আক্রমণ ও অবরোধের প্ল্যান চূড়ান্ত করছিলেন তিনি।

আলফারেসের জাহাজে মেয়েরা বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিল। হাসি তামাশার ফুলঝুরি ছড়াচ্ছিল তারা আলফারেসের কেবিনে। সাগরের নিরানন্দ জীবনে তারা নিয়ে

এলো জীবনের স্পন্দন। কিন্তু যখনই তারা আলাদা হতো, এক ধরনের ধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে যেতো তারা।

আলফারেস মিলাতে পারতেন না মেয়েদের কথা ও কাজ। মেয়েরা তাকে বলেছে, তারা যাযাবর কন্যা। যুদ্ধের কবলে পড়ে তাদের গোত্রের সবাই ধ্বংস হয়ে গেছে। তারা অতি কষ্টে পালিয়ে সমুদ্র তীরে পৌঁছতে পেরেছিল।

কিন্তু আপনজনদের জন্য তাদের কখনো আনমনা হতে দেখেনি আলফারেস। তাছাড়া মেয়েদের স্বভাব এবং চালচলনও যাযাবরদের মতো নয়। যাযাবর মেয়েরা যতই সুশ্রী হোক তাদের চালচলন ও কথাবার্তায় গ্রাম্যতা না থেকেই পারে না। অথচ এরা শহুরে মেয়েদের মতোই সভ্য। শহুরে নাগরিকদের নির্লজ্জতা আর যাযাবরদের অসভ্যতা এক রকম হওয়ার কথা নয়। অথচ এদের জীবন প্রণালী নাগরিকদের মতোই কেতাদুরস্ত।

মেয়েদের কাছে আলফারেসও এক অদ্ভূত মানুষ। মেয়েরা এমনটি আশা করেনি। তারা ভেবেছিল, অন্যান্য পুরুষের মতো সেও হবে নারীলোভী, মাতাল ও কামুক। যেমনটি তারা জীবনভর দেখেছে। কিন্তু আলফারেসের আচরণে সে সবের কোন বালাই ছিল না। ওদের সাথে তিনি মিশতেন, হাসিঠাট্টা করতেন, কিন্তু সবই ছিল নির্দোষ রসিকতা। তার মধ্যে কামনা বাসনার ইঙ্গিতও কখনো লক্ষ্য করেনি ওরা। এতে তারা দারুণভাবে নিরাশ হয়েছিল।

কিন্তু ওরা তার অন্য এক দুর্বলতা ধরতে পেরে উৎফুল্ল হয়ে

উঠলো। দায়িত্বের ব্যাপারে তিনি যেমন কঠিন ও নীতিনিষ্ঠ তেমনি অবসর ও বিনোদনের সময় শিশুর মত সরল ও আমোদপ্রিয় হয়ে যেতেন আলফারেস। তিনি মেয়েদের সাথে নিছক বন্ধুর মতো খেল্লা করতেন। তাদের রূপের প্রশংসা করতেন। তাদের দুষ্টুমীতে মজা পেতেন। তাদের নিয়ে মজার মজার গল্প করতেন। আবার দেখা যেতো, একাকী হলে এই মেয়েদের নিয়েই তিনি ভাবনার অতল তলে হারিয়ে যেতেন।

একদিন আলফারেস তার কামরায় শুয়ে আছেন। পাশের কামরাটি তিনি মেয়েদের থাকার জন্য বরাদ্দ দিয়েছিলেন। এক মেয়ে তার কামরায় এসে দরজা লাগিয়ে দিল। সে আলফারেসের বিছানায় উঠে বসে তাকে উত্তেজিত করতে চেষ্টা করলো। মেয়েটা আসলে দেখতে চাচ্ছিল, তার মধ্যে আদৌ কামনার আগুন আছে কি না।

আলফারেস তার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বললো, 'আমি তোমাদের দু'জনকে যখন প্রথম উপকূলে দেখলাম তখন বলেছিলাম, আমি তোমাদের জাহাজে আশ্রয় দিতে পারি। তোমরা বলেছিলে, আমাদের সাথে কোন প্রতারণা করা হবে না তো? আমি সেদিন বলেছিলাম, আমি তোমাদের দু'জনকে মিশরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করবো। আমি সেই কথাতেই স্থির থাকতে চাই। বিয়ের আগে এমন কোন অশোভন কাজ করবো না, যাতে তোমাদের সন্দেহ জাগে, সাময়িক আনন্দ উপভোগের জন্যই আমি তোমাদেরকে কাছে এনে রেখেছি। তেমনটি করলে তোমরা হয়তো ভাববে, আমি তোমাদের অসহায়ত্ব ও

দুর্বলতার সুযোগ নিতে চাচ্ছি।

আমার সংকল্প তুমি জানো। এবার তুমি চিন্তা দেখো, তোমরা আমার কাছে যে ওয়াদা করেছিলে তা ঠিক রাখবে কিনা? মিশর যাওয়ার আগেই এ ব্যাপারে তোমাদের মন স্থির করা দরকার। যদি আমার কাছে থাকতে চাও, আমাকে আমার সংকল্পে অটুট পাবে। আর যদি আমার কাছে থাকার ব্যাপারে তোমাদের মন সায় না দেয় তবে নিঃসঙ্কোচে তা আমার কাছে খুলে বলতে পারো। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদেরকে পরিপূর্ণ সম্মান ও মর্যাদার সাথে যেখানে যেতে চাও সেখানে পাঠিয়ে দেবো।'

মেয়েটি অধীর হয়ে তার দুই কোমল বাহু দিয়ে আলফারেসের গলা জড়িয়ে রেখেছিল। আলফারেসের কথা শুনে বললো, 'আমরা দু'জনের কেউ তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না। তোমাকে আমরা এক অনন্য পুরুষ হিসেবে পেয়েছি। কোন পুরুষের মধ্যে এমন সততা ও পবিত্রতা থাকতে পারে তোমাকে না দেখলে আমরা বিশ্বাসই করতাম না। আমরা মনে করতাম পুরুষ মানেই পশু, সাক্ষাত শয়তানের চেলা। তুমি আমাদের সে বিশ্বাস গুড়িয়ে দিয়েছো। তোমার মাঝে যে মহত্ব ও মনুষত্ব আছে কোন দেবতার মধ্যেও তা খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা দুস্কর।'

মেয়েটির ভালবাসার অভিনয়ে মোমের মতো গলে গেলেন আলফারেস। নারীর ছলনা কি জিনিষ জানা ছিল না তার। তিনি মেয়েটির প্রতিটি কথা বিশ্বাস করলেন এবং নিজেকে সঁপে

দিলেন মেয়েটির ভালবাসার রঙিন জালে। মেয়েটি যখন বিদায় নিল তখন সে কল্পনার ফানুস উড়িয়ে হারিয়ে গেল প্রেমের রঙিন ভুবনে।

মানুষের এ এক সহজাত দুর্বলতা যে, যে মানুষকে নির্মম অত্যাচার করে বশ করা যায় না, কঠিন শীলা যার হৃদয়ের অর্গল খুলতে পারে না, কামানের গোলা যেখানে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়, হৃদয়ের সামান্য উষ্ণতার টোকা পড়লে সে হৃদয়ের বদ্ধ কপাট খুলে যায় নিমিষে। তখন সে আকাশে উড়ে বেড়াতে পারে, সমুদ্র পাড়ি দিতে পারে, মরুভূমিকে বানিয়ে নিতে পারে পুষ্পিত বাগান। মানুষের চরিত্র ও স্বভাবের এ এক ভয়ংকর দুর্বলতা। দীর্ঘদিন সাগরে অতিবাহিত করা ও ছোট খাটো যুদ্ধের সম্মুখীন হওয়ায় আলফারেসের দেহমনে যে বিষাদময়তা জমা হয়েছিল একটি অচেনা মেয়ের সামান্য দুটি কথায় তা দূর হয়ে গেল। সেই শূন্যতা ও অবসাদ পরিণত হলো শান্তি ও আনন্দে।

এতে তার দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা আরো তীব্র হলো। কাজে কর্মে এলো নব উদ্যম। ছয়টি জাহাজের কমান্ড নিয়ে শত্রুর অপেক্ষায় তিনি প্রহর গুনতে লাগলেন গভীর সমুদ্রে।

ফিলিস্তিনে তখন বিজয়ের পতাকা উড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। একের পর এক শহর ও কেল্লা দখল করে বিদ্যুৎ গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। উপকূলের অধিকাংশ এলাকা দখল করে এসে আসকালান শহরে অবস্থান নিলেন। তারপর এখানে বসে বায়তুল মোকাদ্দাস অধিকার করার চূড়ান্ত পরিকল্পনা করতে লাগলেন।

সমুদ্র পথে খৃস্টানদের সমরসম্ভার, সাহায্য ও খাদ্যশস্য আসার পথ আগলে বসেছিলেন আলফারেস। সাগর পথে ক্রুসেড যোদ্ধাদের জন্য যেন কোন সাহায্য আসতে না পারে তার জন্য তিনি তার বহরকে সদা জাগ্রত অবস্থায় প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তিনি দিনের আরাম ও রাতের ঘুমকে হারাম করে দিয়েছিলেন। খৃস্টান গোয়েন্দা সেই দুই মেয়ে ভেতরে ভেতরে গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে দেখছিল আলফারেসের তৎপরতা। তারা সুযোগের সন্ধানে ছিল। ফেরিওয়ালাবেশী কমান্ডারের সাথে যোগাযোগ হওয়ার পর থেকে অপেক্ষা করছিল তার ইশারার।

আলফারেস একদিন ওই মেয়েদের বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যাযাবরের কোন লক্ষণ নেই। নাগরিক কায়দা কানুন তোমরা এমন চমৎকারভাবে রপ্ত করেছো যে, আমি তোমাদের আচরণ দেখে বিস্মিত হয়ে গেছি। এমন শালীন ও ভদ্র আচরণ তোমরা কেমন করে কোত্থেকে শিখলে?'

'বাহ, আমরা বড় বড় খৃস্টান পরিবারে চাকরী করতাম না?' এক মেয়ে বললো, 'এসব তো তারাই আমাদের শিখিয়েছে। নইলে সম্মানিত মেহমানদের আমরা কিভাবে আপ্যায়ন করতাম?'

অন্য মেয়ে বললো, 'আপনি যদি কোন সাধারণ লোক হতেন তবে আমরা আপনার সাথে ঠিক যাযাবরের মতোই আচরণ করতাম। কিন্তু আমরা জানি, আপনি তা পছন্দ করবেন না। আমাদের ভাগ্য ভাল যে, আমরা বড় বড় খৃস্টান পরিবারে

চাকরী পেয়েছিলাম। নইলে আপনার মতো নৌবাহিনীর এত বড় কমান্ডারের সাথে কেমন ব্যবহার করতে হয় তাইতো আমরা জানতাম না। আমরা কি আপনার সঙ্গে গ্রাম্য আচরণ করতে পারি? আপনি কি আমাদের আচরণ ও ব্যবহারে সন্তুষ্ট নন?'

'আরে তোমরা এমন উত্তেজিত হয়ে উঠলে কেন? আমি কি বলেছি, তোমাদের আচরণ আমার পছন্দ নয়? আমি তো তোমাদের প্রশংসা করছিলাম তোমাদের শিষ্টাচার ও ভদ্রতা দেখে।' বললেন আলফারেস।

অন্যান্য পাঁচ জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং সৈন্যদের কাছেও আলফারেসের জাহাজে দুটি মেয়ে আনার খবর রটে গিয়েছিল। তারা এ সংবাদ শুনে মনে মনে হাসলো। কেউ কেউ কৌতুক বোধ করলো।

সৈন্যরা এ নিয়ে রসালো গল্প করতে মজা পেলেও কমান্ডাররা এ ঘটনায় বেশ চিন্তিত হলো। তারা বলাবলি করতে লাগলো, 'এটা তিনি ঠিক করেননি। জাহাজে স্ত্রী রাখাটা সংগত হলেও কোন অচেনা মেয়েকে জাহাজে রাখা ঠিক নয়। এতে বিপদের আশংকা আছে।'

আলফারেসের যারা ঘনিষ্ট তাদের কেউ কেউ বিষয়টি আলফারেসের কানেও তুললো। কিন্তু আলফারেস তাদের কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন। বললেন, 'তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারো। এরা তেমন মেয়েই নয়।'

আলফারেসের চরিত্র সম্পর্কে জানতো কমান্ডাররা। তারা

দীর্ঘদিন ধরে তাকে সৎ, দায়িত্বশীল ও চরিত্রবান লোক হিসাবে দেখে এসেছে। তিনি দায়িত্বের ব্যাপারে কোন অবহেলা কখনো সহ্য করতেন না।

বায়তুল মোকাদ্দাসের ভেতরের অবস্থা ছিল তখন চরম অশান্ত ও উত্তপ্ত। সেখানে তখনো মুসলমানদের উপর উৎপীড়ন ও নির্যাতন চলছিল। ফিলিস্তিনের অন্য কোন এলাকা দেখে সেই অত্যাচারের নমুনা বুঝার উপায় ছিল না। এই অত্যাচার উৎপীড়নের ইতিহাস অতি পুরাতন।

১০৯৯ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানরা যখন বায়তুল মোকাদ্দাস অধিকার করে, তখন থেকেই শুরু হয় এ অত্যাচার। খৃষ্টানদের এ বিজয় লাভ সম্ভব হয়েছিল মুসলমানদের আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও গাদ্দারীর কারণে। মুনাফেকরাই খৃস্টানদেরকে জেরুজালেম আসার পথ করে দিয়েছিল।

ইতিহাসে খৃস্টানরা এর চেয়ে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ শহরও দখল করেছিল। কিন্তু বায়তুল মোকাদ্দাস তাদের কাছে যে গুরুত্ব লাভ করেছিল সেই গুরুত্ব আর কোন শহরই পায়নি। জেরুজালেম দখলের পর তাদের মনে হলো, তারা অর্ধেক দুনিয়াই দখল করে ফেলেছে। ইউরোপ তথা সমস্ত খৃস্টান জগৎ বায়তুল মোকাদ্দাস দখলকে তাদের সম্মান ও মর্যাদার প্রতীক বানিয়ে নিয়েছিল।

জেরুজালেমের এই গুরুত্বের কারণ, বায়তুল মোকাদ্দাসকে খৃস্টানরা তাদের পবিত্র স্থান মনে করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল, হযরত ঈসা (আ.) এ অঞ্চলেই ক্রুশ বিদ্ধ

হয়েছিলেন। তাছাড়া, মসজিদুল আকসা মুসলমানদের প্রথম কেবলা। রাসুলুল্লাহ (সা.) এখান থেকেই মেরাজে গিয়েছিলেন। এ কারণে মুসলমানরাও বায়তুল মোকাদ্দাসকে পরম পবিত্র স্থান মনে করতো। তাই কাবা ঘরের মতো বায়তুল মোকাদ্দাসও মুসলমানদের প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করতো।

খৃস্টানরা বায়তুল মোকাদ্দাস দখল করে মুসলমানদের নৈতিক মনোবল গুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তারা বেশ সফলও হয়েছিল। তারা চাচ্ছিল, মুসলমানদের আকিদা ও বিশ্বাসের কেন্দ্রস্থলগুলো ধুলিস্মাৎ করে তারা মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেবে। আমাদের ঈমানী দৃঢ়তা নষ্ট করার জন্য তারা চাচ্ছিল এমন একটা ধুম্রজাল সৃষ্টি করতে যাতে ইসলামের মতবাদ ভুল প্রমাণিত হয়। তাহলেই তারা ইসলামকে বাতিল মতবাদ হিসাবে ঘোষণা করতে পারে।

তৎকালীন খৃস্টান গোয়েন্দা প্রধান হরমন মিথ্যা বলেনি, 'ক্রুসেড যুদ্ধ মুসলমান সুলতান ও খৃস্টান সম্রাটদের যুদ্ধ নয়। এটা গীর্জা ও মসজিদের যুদ্ধ। কোরআন ও ক্রুশের যুদ্ধ। এ যুদ্ধ ততোদিন চলবে যতোদিন এ দু'য়ের একটি নিশ্চিহ্ন না হবে।'

এ জন্যই খৃস্টানরা মুসলমানদেরকে যুদ্ধে পরাজিত ও পদানত করার জন্য যে কোন পদক্ষেপ নিতে কুন্ঠিত হতো না। মুসলমানদের নিঃশেষ করার জন্য ধোঁকা, প্রতারণা, ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত, গুপ্ত হত্যা সবকিছুকেই বৈধ এবং অসীম পূণ্যময় কাজ

বলে মনে করতো খৃস্টানরা।

খৃস্টান পাদ্রী সৈন্যদের যুদ্ধের উস্কানি দিতে গিয়ে মুসলমানকে হত্যা করাকে অসীম সওয়াবের কাজ বলে প্রচার করতেন। ইউরোপের বড় কোন পাদ্রীকে দেয়া হতো বিশপের মর্যাদা। আক্রার পাদ্রী ছিলেন তখনকার বিশপ। হাতিনের রণাঙ্গনে এই পাদ্রী স্বয়ং মহান ক্রুশ নিয়ে উপস্থিত ছিলেন খৃস্টানদের মনোবল অটুট রাখার জন্য। খৃস্টানরা বিশ্বাস করতো, এই ক্রুশেই বিদ্ধ হয়েছিলেন হযরত ঈসা (আ.)।

এভাবেই খৃস্টান ধর্মীয় নেতারা ইসলামের বিরুদ্ধে সরাসরি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। তাই এ যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ না হয়ে ধর্মীয় যুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। খৃস্টান গোয়েন্দা প্রধান হরমন এ জন্যই বলতেন, 'এটি দুই বিশ্বাস ও মতবাদের যুদ্ধ।'

পাদ্রীরা ক্রুসেড যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য খৃস্টান সম্রাটদের কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছিলেন। পাদ্রীদের ইচ্ছার কারণে সম্রাটরা ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। শুধু সম্রাটরা নয়, ক্রুসেড যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সকল নাইট এবং সৈন্যদেরও ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করতে হতো। এভাবেই খৃস্টান পাদ্রীরা বিশ্বব্যাপী এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ছড়িয়ে দিয়েছিল।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে এই প্লাবনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। পতনোন্মুখ জাতিকে দিয়েছিলেন বিজয়ের সুসংবাদ। খৃস্টানদের বিভিন্ন ঘাঁটি ও কেল্লা দখল করে তিনি এসে দাঁড়িয়েছিলেন বায়তুল মোকাদ্দাসের সন্নিকটে।

খৃস্টান এবং মুসলমাম উভয় জাতিই ধর্মীয় উন্মাদনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এই যুদ্ধে। এ যুদ্ধ উভয় জাতির মধ্যে এমন উন্মাদনা সৃষ্টি করলো যে, খৃস্টান মেয়েরা তাদের গহনা, সোনাদানা, নগদ অর্থ সবই গীর্জার পাদ্রীর কাছে তুলে দিচ্ছিল যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য। একই অবস্থা ছিল মুসলমানদের মধ্যেও।

মুসলমান নারীরা উদগ্রীব ছিল যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য আর খৃস্টান যুবতীরা জাতির স্বার্থে নিজের সতীত্ব ও মানসম্ভ্রম সবই বিকিয়ে দেয়ার জন্য ছিল প্রস্তুত।

খৃস্টান ধর্ম নেতারা ক্রুসেড যুদ্ধে নীতিনৈতিকতা বিসর্জন দেয়াকে কেবল বৈধ নয়, খৃস্টানদের জন্য তা অপরিহার্য করে দিয়েছিল। মুসলমানদের পরাজিত করার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপশি তারা চালিয়ে যাচ্ছিল গুপ্তহত্যা ও ষড়যন্ত্র। মেয়েদেরকে লেলিয়ে দিত মুসলমানদের চরিত্র হননের জন্য। তাদের বলা হতো, তোমাদের সম্ভ্রম ও সতীত্বের বিনিময়ে তোমরা লাভ করবে অনন্ত সুখের স্বর্গ।

এই বিশ্বাসের ভিত্তিতেই খৃস্টানরা তাদের সুন্দরী মেয়েদের প্রশিক্ষণ দিয়ে মুসলমান নেতা, আমীর ও সেনাপতিদের কাছে পাঠিয়ে দিত। তারা মুসলমান আমীর ও শাসকদের অন্দর মহলে প্রবেশ করে সেখানে ধ্বংসের যে বীজ বপন করতো সেই বীজ মুসলমানদের ঘরে ঘরে তৈরী করতো গাদ্দার।

এই ছলনার জালে জড়িয়ে মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হতো। খৃস্টান নারীদের খপ্পরে পড়ে ভুলে যেতো

নিজের বিশ্বাস ও আকিদার কথা। তাদের মধ্যে জন্ম নিত রাজ্য ও ক্ষমতার মোহ। তারা নিজের ঈমান বিকিয়ে দিয়ে শত্রুর গোলামে পরিণত হয়ে যেতো।

খৃস্টানদের এই মধুর ছোবল থেকে তারাই বাঁচতে পারতো যারা সচেতন। এ সব লোকের ঈমান হতো সাচ্চা ও দৃঢ়। কেবল এই সচেতন লোকদের আত্মাগুল্যেই ঈমানের আলোয় আলোকিত থাকতো।

এ ধরনের একদল ঈমানদারই বায়তুল মোকাদ্দাস উদ্ধারের শপথ নিয়েছিল। তারা বায়তুল মোকাদ্দাসের জন্য জীবনের শেষ রক্ত বিন্দু দিতেও কুণ্ঠিত ছিল না। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, একজন বিশ্বাসঘাতকই সমস্ত জাতিকে ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত করার জন্য যথেষ্ট। যদি নিজের আস্তিনের ভেতর বিশ্বাসঘাতক লুকিয়ে থাকে তবে শত্রুর চেয়ে শতগুণ শক্তিশালী হওয়ার পরও তাকে পরাজয় বরণ করতে হয়। কারণ শত্রুর কেনা গোলাম রাতের অন্ধকারে ঘরের দরজা খুলে দেয় দুশমনের জন্য।

এমনি একটি ঘটনা ঘটেছিল ১৫ জুলাই ১০৯৯ খৃস্টাব্দে। খৃস্টানরা সেদিন বায়তুল মোকাদ্দাসের উপর আধিপত্য লাভ করার জন্য এগিয়ে আসছিল। সে সময় কতিপয় মুসলমান আমীর ও শাসক খৃস্টানদের সাহায্য না করলে খৃস্টানদের পক্ষে জেরুজালেম দখল করা কোনদিনই সম্ভব হতো না। সেই বেদনাঘন কলংকময় ইতিহাস বড়ই তিক্ত ও দুঃসহ। যখন ক্রুসেড বাহিনী বায়তুল মোকাদ্দাসের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখন যদি শাহজার আমীর খৃস্টানদের রাস্তা না দেখাতো এবং

তাদের খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করে সাহায্য না করতো তবে জেরুজালেমের ইতিহাস হতো ভিন্ন রকমের।

হিম্মাত এবং ত্রিপোলীর মুসলমান আমীররাও শাহজার আমীরের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। তারাও সাহায্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল খৃস্টানদের প্রতি। খৃস্টানরা তাদের জন্য মেলে ধরেছিল উপঢৌকনের ডালি। সেই উপহার পেয়েই গাদ্দাররা মুসলমানদের প্রথম কেবলা ধ্বংসের পথ সুগম করেছিল।

ক্রুসেড বাহিনীর অগ্রাভিযানের পথে ছোট ছোট যে সব মুসলিম রাষ্ট্র পড়েছিল তারা তাদের নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে খৃস্টানদের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছিল তাদের এগিয়ে চলার পথ। খৃস্টানদের দেয়া উপহার সামগ্রী গ্রহণ করে মেনে নিয়েছিল তাদের সব দাবী, পূরণ করেছিল তাদের সব প্রয়োজন।

শুধু ব্যতিক্রম ছিলেন ইরকার আমীর। তিনি একজন মর্দে মোমিন ও মুজাহিদ ছিলেন। ক্রুসেড বাহিনীর তুলনায় তার শক্তি ছিল নিতান্ত নগন্য। কিন্তু তিনি ক্রুসেড জেনারেলের দেয়া সুন্দর উপহার গ্রহণ করেননি। তিনি তাদের দাবী পূরণ করতে অস্বীকার করে ক্রুসেড বাহিনীর সাথে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন। ক্রুসেড বাহিনী তার শহর অবরোধ করলো। কিন্তু তিনি প্রাণপণে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করে দিলে খৃস্টান বাহিনী তার সাহস ও বীরত্ব দেখে বিস্মিত হয়।

১০৯৯ খৃস্টাব্দের ১৪ ফেব্রুয়ারী থেকে ১৩ মার্চ পর্যন্ত পুরো

এক মাস অবরোধ করেও তারা ইরকার আমীরের মাথা নোয়াতে পারেনি। অবশেষে ক্রুসেড বাহিনী বহু জান মালের ক্ষতি স্বীকার করে ইরকার অবরোধ উঠিয়ে নিতে বাধ্য হয়। ইরকার আমীর খৃস্টানদেরকে তার ভূমি ব্যবহার করতে না দেয়ায় খৃস্টানরা রাস্তা পরিবর্তন করে ঘুর পথে বায়তুল মোকাদ্দাসে অভিযান চালাতে বাধ্য হয়েছিল বলেই তাদের টার্গেটকৃত নির্ধারিত সময়ে তারা জেরুজালেম যেতে পারেনি।

নির্বোধ মুসলমান আমীররা যদি সেদিন ইরকার আমীরের মতো খৃস্টানদের সামনে বাঁধার প্রাচীর তুলে দিত তবে একের পর এক বাঁধা মাড়িয়ে অগণিত জানমালের ক্ষতি স্বীকার করে ক্রুসেড বাহিনীর পক্ষে বায়তুল মোকাদ্দাসের দ্বারপ্রান্তে পৌছা কিছুতেই সম্ভব হতো না। এভাবে বায়তুলর মোকাদ্দাস পৌছতে গেলে কম করেও তাদের দুই আড়াই বছর সময় লেগে যেতো। ততোদিনে বায়তুল মোকাদ্দাস জয় করার মনোবল ও স্বপ্নসাধ নিঃশেষ হয়ে যেতো ক্রুসেড বাহিনীর।

ইতিহাস কোনদিনই সেই সব শাসককে ক্ষমা করবে না, যারা ক্রুসেড বাহিনীকে বায়তুল মোকাদ্দাস পর্যন্ত পথ দেখিয়েছিল। যারা তাদের অর্থ ও খাদ্য সাহায্য দিয়ে তাদের মনোবলকে অটুট রেখেছিল। কতিপয় মুসলিম আমীরের গাদ্দারীর শাস্তি ভোগ করতে হলো সমগ্র জাতিকে। প্রায় পৌনে এক শতাব্দী ধরে মুসলমানদের উপর চেপে রইলো পরাধীনতার কঠিন শৃংখল।

এই অভিশাপ থেকে জাতিকে বাঁচানোর কঠোর সংকল্প

নিয়েই ছুটে এসেছেন সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী। পথের সমস্ত বাঁধা মাড়িয়ে এসে পৌঁছেছেন জেরুজালেমের সন্নিকটে।

বায়তুল মোকাদ্দাস যখন খৃস্টানরা দখল করে তখন সেখানে বহু দেশের তীর্থ যাত্রীও ছিল। তারা সবাই ক্রুসেড বাহিনীর নির্মম ধ্বংস যজ্ঞের শিকার হয়েছিল।

১০৯৯ সালের ৭ জুন ক্রুসেড বাহিনী বায়তুল মোকাদ্দাস অবরোধ করে। তখন মিশরের গভর্ণর ইফতেখারউদ্দৌলা বায়তুল মোকাদ্দাসের শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। সামান্য গভর্ণর হয়েও শেষ শক্তি দিয়ে লড়াই করেন তিনি।

অসাধারণ সামরিক কৌশল প্রয়োগ করেন খৃস্টানদের কবল থেকে পবিত্র ভূমি রক্ষা করার জন্য। সামান্য সৈন্য নিয়ে বিশাল বাহিনীর স্রোত মাসাধিক কাল আটকে রাখেন শহরের বাইরে। অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করে তিনি সৈন্য নিয়ে শহরের বাইরে চলে আসতেন। কচুকাটা করতেন আগ্রাসী বাহিনীকে। বীর বিক্রমে যুদ্ধ করে তিনি প্রমাণ করছিলেন মুসলমান জান দিতে জানে কিন্তু মান দিতে জানে না।

কিন্তু ক্রুসেড বাহিনীর বেপরোয়া সয়লাব ও উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের মুখে গুটিকয় মুজাহিদ আর কতোক্ষণ টিকে থাকবে? ১০৯৯ সালের ১৫ জুলাই মুজাহিদদের লাশের ওপর দিয়ে শহরে প্রবেশ করলো ক্রুসেড বাহিনী।

এ বিজয়ের আনন্দে সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলো এবং বিশ্বের সর্বত্র খৃস্টান দেশগুলোতে শুরু হয়ে গেল বিজয়ের উৎসব। কিন্তু সর্বাধিক ভয়াবহ ও নির্মম উৎসব পালিত হলো

বায়তুল মোকাদ্দাসে। বিজয়ী ক্রুসেড বাহিনী মুসলমানদের গৃহে হায়েনার মত প্রবেশ করলো। বেপরোয়া লুটপাট করলো প্রতিটি মুসলিম ঘরে। কোন ঘরে কোন পুরুষ মানুষ, হোক সে বৃদ্ধ বা দুগ্ধ পোষ্য শিশু, কাউকে জীবিত রাখলো না।

জীবিত ছিল শুধু যুবতী মেয়েরা, যারা হয়েছিল পশুদের লালসার খোরাক। রাস্তায় পলায়নরত মুসলমান শিশু, নারী, পুরুষ যাকেই পেল, তাকেই নির্মমভাবে হত্যা করলো। খৃস্টানরা কোলের শিশুকে বর্শার আগায় বিদ্ধ করে উপরে তুলে চিৎকার দিত আর হো হো করে হাসতো জল্লাদের মতো। প্রকাশ্য রাস্তায় হাজারো চোখের সামনে মেয়েদের সতীত্ব নাশ করে ফেটে পড়তো অট্টহাসিতে। তারপর সেই মেয়েকে হত্যা করে তার কাটা মাথা বর্শার আগায় বিদ্ধ করে শুরু করতো জংলী নৃত্য। মানুষ হত্যা করা তাদের কাছে ছিল সবচে আকর্ষণীয় ও প্রিয় খেলা।

মুসলমানদের আশ্রয়ের কোন স্থান ছিল না। এমন কোন নিরাপদ জায়গা ছিল না যেখানে তারা একটুখানি আশ্রয় পেতে পারে।

একদল নারী ও শিশুসহ কিছু সংখ্যক মুসলমান ভেবেছিল আল্লাহর ঘর মসজিদে নিশ্চয়ই হামলা করবে না খৃস্টানরা। মসজিদকে নিরাপদ আশ্রয় ভেবে তারা মসজিদুল আকসায় গিয়ে আশ্রয় নিল। খৃস্টান সৈন্যরা যখন দেখলো শিশু ও নারীসহ সব ধরনের মানুষই জমায়েত হয়েছে সেখানে, ওরা অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। মসজিদের চত্বর ভরে গিয়েছিল একদল ভয়ার্ত,

অসহায় ও দিশেহারা মানুষে। সেখানে মানুষের দাঁড়ানোরও আর জায়গা ছিল না।

যারা মসজিদুল আকসার চত্বরে জায়গা পায়নি তারা ছুটলো বাবে দাউদ ও অন্যান্য মসজিদে। এভাবে জেরুজালেমের প্রতিটি মসজিদে আশ্রয় নিল হাজার হাজার মুসলমান। যারা মসজিদুল আকসায় ঠাঁই পেয়েছিল তাদের মনে বেঁচে যাওয়ার একটা আশা এ জন্যই বাসা বেঁধেছিল যে, এ মসজিদকে সকল ধর্মের লোকই পবিত্র স্থান মনে করে। এমতাবস্থায় এ পবিত্র ঘরে নরহত্যার দুঃসাহস করবে না কোন হামলাকারী।

ইউরোপের ঐতিহাসিকরা লিখেছেন, জেরুজালেম দখলের সময় ভীতসন্ত্রস্ত মুসলমানরা বিভিন্ন মসজিদ ও উপাসনালয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। এই শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের সংখ্যা ছিল সত্তর হাজারের অধিক।

খৃস্টানরা মসজিদুল আকসাকে তাদেরও ইবাদতখানা এবং পবিত্র স্থান মনে করতো। কিন্তু বিজয়ের উল্লাসে মাতোয়ারা খৃস্টানদের মনে তখন স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধির লেশমাত্র ছিল না। তারা তখন হয়ে উঠেছিল পশুর অধিক পশু। তারা মনে করলো, পবিত্র ঘরে শত্রু নিধন করতে পারলে অধিক পূণ্য লাভ করা যাবে। তাই তারা কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, হিংস্র দস্যুর মত ঝাঁপিয়ে পড়লো বায়তুল মোকাদ্দাসে আশ্রয়প্রার্থী হাজার হাজার নিরীহ মুসলমানদের ওপর।

একটি বাচ্চা শিশুও তাদের এই বর্বরতার হাত থেকে রক্ষা পেলো না। মসজিদুল আকসা, বাবে দাউদ ও শহরের অন্যান্য

মসজিদগুলো লাশে ঠাসাঠাসি হয়ে গেল। মসজিদ থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়ে এসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো রাস্তায়। ঐতিহাসিকগণ লিখেছেন, 'রাস্তায় এতো রক্ত জমা হলো যে খৃস্টান অশ্বারোহীদের ঘোড়াগুলোর পা সেই রক্তে ডুবে যেতো।'

মসজিদের ভেতর থেকে মুসলিম মেয়েদের জোরপূর্বক টেনে বের করে তাদের উলঙ্গ করে হাকিয়ে নেয়া হতো। যেখানে সেখানে যখন তখন ঘটতো তাদের সম্ভ্রম ও সতীত্ব হরণের ঘটনা। নির্যাতীত মেয়েরা অজ্ঞান হয়ে গেলে তাদের মাথায় পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতো তাদের। তারপর আবার চলতো তাদের ওপর পাশবিক নিপীড়ন।

পুরুষদের হত্যা করে ফেলায় শহরে শ্রমিক সংকট দেখা দিল। তখন এই মেয়েদের ওপর চাপিয়ে দিল অমানুষিক কঠোর পরিশ্রমের কাজ। এই সব মেয়েদের দিয়ে তারা পরিশ্রমের কাজ করিয়ে নিলেও সেই অনুপাতে খাবার দিত খুবই কম। এই মেয়েদের তারা লাগালো মসজিদ ভাঙ্গার কাজে।

যে মেয়ে কাজ করতে অক্ষম হয়ে পড়তো তাকে নির্দয়ভাবে প্রহার করতো। যখন বুঝতো এই মেয়েকে দিয়ে আর কোন কাজ করানো যাবে না তখন তাকে জবাই করে তার গোশত তুলে দিত বাবুর্চির হাতে। বাবুর্চি গরু ছাগলের গোশতের মতোই সেই গোশত রান্না করে খৃস্টান অফিসার ও সৈন্যদের খেতে দিত।

মানুষের গোশত খাওয়ার এই রেওয়াজ প্রথমে জেরুজালেমেই চালু হয়। এক হিংস্র খৃস্টান যুদ্ধবন্দী এক মুসলমানকে জবাই করে তার শরীরের গোশত বাবুর্চির হাতে দিয়ে বললো, 'রান্না করে দাও, আজ এই দিয়েই ভুঁড়িভোজ করবো।'

রান্নার পর সেই গোশত খেয়ে সে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে সঙ্গীদের বললো, 'খেয়ে দেখো কেমন স্বাদ।' তারপর থেকেই সেখানে মুসলানদের মাংস খাওয়ার প্রথা চালু হয়ে গেল। যখনই কোন উৎসব ও ভোজসভার আয়োজন হতো তখনই মোটা তাজা মুসলমান ধরে জবাই করে তার মাংস রান্না করে খাওয়ানো হতো। ইউরোপের খৃস্টান ঐতিহাসিকরাও মানুষ খাওয়ার এই অমানবিক প্রথার কথা তাদের লেখায় উল্লেখ করেছেন।

মুসলিম শূন্য মসজিদগুলোকে তারা বিভিন্ন ভাবে ব্যবহার করতে শুরু করলো। অপূর্ব কারুকার্যখচিত কিছু মসজিদ তারা ভেঙ্গে গুড়িয়ে দিল। কিছু মসজিদকে বানিয়ে নিল পতিতালয়। কিছু মসজিদকে বানালো খৃস্টান সৈনিকদের ঘোড়ার আস্তাবল।

মসজিদুল আকসায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সুলতান ও সরকার প্রধান এবং অভিজাত দর্শনার্থীরা সোনা রূপার ঝাড়বাতি ও সৌন্দর্যবর্ধক নানা জিনিষ দান করেছিলেন। খৃস্টানরা সেই সব মূল্যবান উপহার সবই লুট করে নিল। তারপর তারা মসজিদের মেহবারের ওপর স্থাপন করলো তাদের পবিত্র ক্রুশ, মা মেরীর ছবি ও হযরত ঈসা (আ)-এর মুর্তি।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী শৈশবেই বায়তুল মোকাদ্দাসের অবমাননা ও সেখানকার মুসলমানদের ওপর যে নির্মম হত্যাকান্ড এবং বর্বরতা চালানো হয় সেই কাহিনী তার পিতা নাজমুদ্দিন আইয়ুবীর কাছ থেকে শুনিয়েছিলেন। তার পিতা এ কাহিনী শুনিয়েছিলেন তার দাদার কাছ থেকে।

এ নির্মম কাহিনীর প্রভাব সুলতান আইয়ুবীর শিরায় শিরায় মিশে গিয়েছিল। শৈশবেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, সময় হলে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাস মুক্ত করবেন।

আসকালান থেকে সৈন্য চালানোর আগে তিনি আরেকবার স্মরণ করলেন সেই প্রতিজ্ঞার কথা। ভাবলেন, আজ আর স্বপ্ন নয়, জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্ন পূরণের দ্বারপ্রান্তে তিনি এসে পৌঁছেছেন। আর মাত্র চল্লিশ মাইল দূরে তাঁর স্বপ্নের শহর জেরুজালেম। যে শহরে আছে রাসূলের স্মৃতি বিজড়িত মসজিদ বায়তুল মোকাদ্দাস। সেই মসজিদুল আকসায় দু'রাকাত নফল নামাজ পড়ার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

পরবর্তী বই ক্রুসেড-২৯

যাযাবর কন্যা

ক্রুসেড-২৮
রক্তস্রোত
আসাদ বিন হাফিজ